মানুষ ও বাঘ

কল্যাণ চক্রবর্তী

জীবিকাসূত্রে কল্যাণ চক্রবর্তী প্রথমাবধি যুক্ত বন ও বন্যপ্রাণী-সংরক্ষণের সঙ্গে। তদুপরি দীর্ঘদিন তিনি ছিলেন সুন্দরবন ব্যাঘ্র-প্রকল্পের অধিকর্তা। সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি উপহার দিয়েছেন এই অসাধারণ তথ্যসমৃদ্ধ কৌতূহলকর আলোচনাগ্রন্থটি। 'মানুষ ও বাঘ' বাংলা সাহিত্যের প্রথম বই, যেখানে একদিকে রয়েছে বাঘের উপর বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার যাবতীয় মূল্যবান তথ্য, অন্যদিকে মানুষ ও মানুষখেকো বাঘের সম্পর্ক নিয়ে বহু চমকপ্রদ, অন্তরঙ্গ, আশ্চর্য কাহিনী। বাঘ কেন হয়ে ওঠে নরখাদক, সুন্দরবনের বাঘ আলাদা রকমের নাকি অন্যান্য বাঘের মতোই, বাঘ-গণনা হয় কীভাবে, পর্যটনশিল্পে বাঘের ভূমিকা কী ও কতখানি, ব্যাঘ্র-সংরক্ষণ কেন জরুরি, বাঘের সঙ্গে পূজার্চনার কী সম্পর্ক, কেমন স্বভাব বাঘের— এমনতর অজস্র প্রশ্নের বিজ্ঞানসম্মত ও অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত উত্তর এই গ্রন্থের ...য়-পাতায় ছড়ানো। লেখার ভঙ্গিও ...চিত্তাকর্ষক। সমাজবিজ্ঞানী থেকে ...বজ্ঞানী, ছাত্র থেকে গবেষক, ...র্থী থেকে সাধারণ জিজ্ঞাসু ...ঠক— প্রত্যেকেই এ-বই পড়ে তৃপ্ত হবেন।

১৬·০০

ISBN 81-7066-151-X

মানুষ ও বাঘ

মানুষ ও বাঘ

কল্যাণ চক্রবর্ত্তী

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড
কলকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৮৮ মুদ্রণ সংখ্যা ২২০০
প্রচ্ছদ অমিয় ভট্টাচার্য

ISBAN 81-7066-151-X

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য : ১৬·০০

সূচী

ভূমিকা

শ্রীকল্যাণ চক্রবর্তী পশ্চিমবঙ্গের বন বিভাগের একজন পদস্থ কর্মচারী। তিনি সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের দ্বিতীয় অধিকর্তাও ছিলেন। সেই সুবাদে সুন্দরবনের ম্যাংগ্রোভ-বন এবং বাঘদের খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগও তাঁর হয়েছিলো। সুন্দরবনে যে সব অগণিত হতভাগ্য মানুষ প্রতিবছরই নিরুপায় হয়ে জীবিকার্জনের জন্যে মাছ বা কাঁকড়া ধরতে, কাঠ বা গোলপাতা কাটতে অথবা মধু পাড়তে সুন্দরবনে যান এবং মানুষখেকো বাঘের কবলিত হন তাঁদেরও কাছ থেকে জানার সুযোগ তাঁর হয়েছিলো। সেই কারণে তাঁর "বাঘ ও মানুষ" বইটির বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। ঠিক এই ধরনের ও এই বিষয়ের উপর বই বাংলাভাষায় বেশি নেই। শ্রীবিশ্বনাথ বসুর একটি বই আছে "ভারতের জাতীয় পশু বাঘ"। কিন্তু সেই বইটি ভালো হলেও শুধুই বাঘ সম্পর্কিত। বাঘের আবাসভূমি সুন্দরবনের পটভূমিতে বাঘের দৌরাত্ম্য কল্যাণবাবুর বইয়ে পরিস্ফুট হয়েছে।

সুন্দরবনের মানুষখেকো বাঘ যে কীরকম বেপরোয়া এবং তারা যে প্রায় অপ্রতিরোধ্যই সে কথাও স্পষ্ট হয়েছে এই বইয়ে। সুন্দরবনের সব বাঘই মানুষখেকো নয় এই তথ্য বন বিভাগের নথিপত্র নির্ভর করে তিনি বলেছেন। সুন্দরবন সম্বন্ধে আমার যেটুকু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে তাতে কিন্তু মনে হয়েছে যে সুন্দরবনের প্রত্যেক বাঘই মানুষখেকো। যে সব দ্বীপের বাঘ মানুষ ধরেনি সেই সব দ্বীপে হয়তো বাঘের স্বাভাবিক খাদ্য বহুল পরিমাণে ছিল বা আছে অথবা মানুষ সেই সব দ্বীপে জীবিকার কারণে যায় না। যাই হোক, ভূমিকা লিখতে বসে লেখকের বক্তব্যর বিরুদ্ধাচরণ করাটা আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়। কিছু কিছু বক্তব্য কল্যাণবাবু এই বইয়ে রেখেছেন যা সম্বন্ধে তাঁর কোনো কোনো সহকর্মীরও অন্য মত থাকতে পারে। তাতে কিছু এসে যায় না কারণ কল্যাণবাবু এই বইয়ে তাঁর নিজের মতই ব্যক্ত করেছেন।

সাম্প্রতিক অতীত থেকে সাধারণের মধ্যে এবং বিশেষ করে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে অরণ্য, অরণ্যপ্রাণী এবং বিশেষ করে বাঘ সম্বন্ধে এক অদম্য কৌতূহল জাগরূক হয়েছে যা নিশ্চয়ই সুখবহ। তাঁদের অনেক জিজ্ঞাসারই নিরসন করবে এই বই।

এই বইয়ে অনেক তথ্যও পুঞ্জীভূত করেছেন কল্যাণবাবু। তা সাধারণ পাঠকের চোখে অনাবশ্যক ঠেকলেও যাঁরা এ বিষয়ে উৎসাহী তাঁদের বিশেষই

উপকারে আসবে।

সুন্দরবনের বাঘের মানুষ ধরার নানা মর্মন্তুদ কাহিনী উনি গ্রন্থন করে পরিবেশন করেছেন যা পড়ে পাঠকের গায়ে কাঁটা দেবে এবং কী নিদারুণ দারিদ্র যে মানুষকে বিনা প্রচারে, বিনা বাহবায় এই চিরায়ত বিপদের ঝুঁকি ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে নিতে বাধ্য করে তা জানতে পেরে স্তম্ভিত করবে। তাঁদের কারো কারো মনে এ প্রশ্নও জাগবে যে, কোনো সভ্য দেশে মানুষ মেরে বাঘ বাঁচানো আদৌ উচিত কি না! এই কাহিনীগুলিকে "জনপ্রিয়" আখ্যা না দিলেই বোধহয় ভালো হত।

এই বইয়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও আকর্ষক অধ্যায় হচ্ছে "কী করে বাঘ গোণা হয়"। এ যাবৎ বন বিভাগের এই গোপন বীজগাণিতিক প্রক্রিয়াটি সাধারণের কেন অনেক বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞদেরও অজানা ছিলো। এটি প্রকাশ করে খুবই ভালো কাজ করেছেন কল্যাণবাবু।

বাঘের সংখ্যা ১৯২০-তে ৪০ হাজার ছিলো। ১৯৪০-এ তা কমে ৩০ হাজার হয়। ১৯৬০-এ (দেশ স্বাধীন হওয়ার পর) তা কমে ১৫ হাজার হয়। এবং ১৯৭২-এ তা আরও কমে ১৮০০-তে এসে দাঁড়ায়। বাঘের সংখ্যাহ্রাসের কারণ হিসেবে কল্যাণবাবু একমাত্র শিকারীদেরই দায়ী করেছেন। শিকারীরা এখন পাণ্ডা ভাল্লুকের চেয়েও বিপন্ন প্রজাতি এবং তাঁদের স্বপক্ষে একটি কথা বলাও "সুরুচির" পরিচায়ক নয় যদিও তবুও বলতেই হয় যে শুধুমাত্র শিকারীরাই নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রান্ত নীতি এবং ভারতের সমস্ত রাজ্যের বন বিভাগের কর্তব্যজ্ঞানহীনতাও বাঘের সংখ্যাহ্রাসের জন্যে সমানভাবেই দায়ী। তবে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার ক্ষেত্র এ নয়।

বাঘ শিকারও নাকি নেহাৎ বাঁচ্চোকা খেল্ অথচ গহন বনে বন্য-বাঘ (অভয়ারণ্যর প্রায়-পোষা এবং মানুষে-অভ্যস্ত বাঘ নয়) দেখেই যে কোনো মানবসন্তানেরই যে কী প্রকার অবস্থা হয় তাতো কল্যাণবাবুও ভালোই জানেন। শিকারীদের গালমন্দ করা অধুনা আর্ম-চেয়ার—কনসার্ভেশানিস্টদের এক আধুনিকতম ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে কিন্তু যাঁরা বাঘ সম্বন্ধে কিছু জানেন শোনেন তাঁদের কাছেও এই দৃষ্টিভঙ্গী আশা করা যায় না।

আমি কল্যাণ চক্রবর্তীর এই বইটির বহুল প্রচার কামনা করি এবং আশা করি তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা এরকম আরও অনেক বই আমাদের উপহার দেবেন। বাংলাভাষায় বন-পালকদের লেখা ও তাঁদের অভিজ্ঞতা-উজ্জ্বল বই বেশি নেই। অথচ থাকা উচিত ছিলো।

বুদ্ধদেব গুহ

বাঘ ও তার পরিবেশ

১৯৬৭ সালে জলপাইগুড়ি জেলার জলদাপাড়া অভয়ারণ্যে প্রথম স্বাভাবিক পরিবেশে বাঘ দেখি। তখন আমি সবে বনবিভাগের চাকরিতে ঢুকেছি। হাতির পিঠে করে যাচ্ছিলাম জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের মধ্য দিয়ে। চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বনের সৌন্দর্য্য উপভোগ করছিলাম আর মাহুতকে নানা প্রশ্ন করছিলাম। হঠাৎ যেতে যেতে মাহুত থমকে দাঁড়াল—বল্‌ল, স্যার আমাদের দিকেই বাঘ আসছে। জঙ্গলে বাঘ দেখ্‌ব—হঠাৎ সমস্ত শরীরের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে গেল—মুহূর্তের মধ্যেই একেবারে আমাদের থেকে দশ/বারো গজ দূরে হাতির দিকে মুখ করে তাকিয়েই বাঘটি মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকাল। কিন্তু সেখানেই বসে রইল। হাতিও নট-নড়ন-চড়ন। এতদিন পরেও মনে পড়ছে বাঘটি ছিল লম্বায় বেশ বড়—উজ্জ্বল ডোরা কাটা হলুদে ঢাকা। প্রায় তিন/চার মিনিট সেভাবেই কাটল। হঠাৎ বাঘটি আবার হাতির দিকে মুখ ঘুরিয়ে এমন একটা মুখের আকৃতি করল যে আমাদের পোষা হাতিটি ভয়ে পিছু হটে গেল। মাহুত বল্‌ল—এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল—কারণ বাঘের ব্যবহার নাকি ভাল নয়। যে কোন সময় আক্রমণও করতে পারে। আমার মাস দুয়েকের বনবিভাগের চাকুরীর অভিজ্ঞতা স্বাভাবিক কারণেই অভিজ্ঞ মাহুতকে অন্য কোন পরামর্শ দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাই আমি মাহুতকেই অনুসরণ করলাম কারণ ওর জঙ্গলের অভিজ্ঞতা ও বন ও বণ্যপ্রাণী সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক জ্ঞানের মূল্য ফেলে দেওয়ার মত নয়। তবে প্রথম দর্শনেই বাঘকে দেখে ভালবেসে ফেলেছি—কেউ হয়ত বল্‌বেন ঠাট্টা করে "লাভ এট ফার্স্ট সাইট"। এ প্রাণীটির এমন একটা অনুপম সৌন্দর্য রয়েছে যা কিনা সহজেই মানুষকে মোহিত করে ও মানুষেরাও সর্বপ্রকার বিশেষণের ঝুড়ি নিয়ে বসে যায় বাঘকে বর্ণনা করার সময়। মাহুত পিছু হটে গেল হাতি নিয়ে আমি কিন্তু পেছন ফিরে

ফিরে বাঘটিকে লক্ষ্য করতে লাগলাম—যতদূর পর্যন্ত দেখা যায়। সেই প্রথমবার বনে বাঘ দেখার পর থেকেই নিজের অজান্তেই বোধহয় এ প্রাণীটিকে ভালবেসে ফেলেছিলাম। এ প্রাণী সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবেই ভীষণরকম কৌতূহল অনুভব করেছিলাম। এর পরে যতবারই বাঘ দেখেছি প্রত্যেকবারই সে কৌতূহল মেটানর সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। কিন্তু সুন্দরবনে দীর্ঘ দশ বছর বনাভ্যন্তরে ঘুরে ঘুরে বহু বার বাঘ দেখেও কিন্তু আজও আমি সমান কৌতূহলী এ প্রাণীটি সম্পর্কে। বাঘ অবশ্য ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের বনাঞ্চলেও দেখেছি। উত্তরপ্রদেশের জিম করবেট ন্যাশনাল পার্কের এক নরখাদক বাঘের কাহিনী মনে পড়ে যাচ্ছে। প্রকৃতিবিজ্ঞানী ব্ল্যান্ডফোর্ড ও লিডেকার তাঁদের গ্রন্থে বাঘ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে পুরুষ বাঘ নাকি একটি বাঘিনীতেই আসক্ত—একাধিক বাঘিনীতে নয়। কিন্তু এ প্রসঙ্গে আমার অভিমত সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমার বিভিন্ন বন থেকে সংগৃহীত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান বলে যে বাঘ প্রাণীটি পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চল্‌তে খুবই সচেতন ও সক্ষম। তাই পরিবেশের বিভিন্নতা বাঘের জীবনবিজ্ঞানেও রেখাপাত করে বিশেষভাবে। আমি সুন্দরবনে ও ভারতবর্ষের অন্যান্য বনাঞ্চলেও লক্ষ্য করেছি যে একটি বাঘ একাধিক বাঘিনীর সঙ্গে যৌনভাবে মিলিত হয়। ব্যাঘ্র চরিত্রের একটি দিক আমার কাছে বিশেষভাবে আলোকিত হয়েছে—সেটি হল পুরুষ বাঘের বাঘিনীর উপস্থিতিতে প্রদর্শন করার বিশেষ প্রচেষ্টা—যদিও সমগ্র প্রাণীজগতের পক্ষেই এ ধরণের প্রদর্শনগ্রস্ত স্বভাব লক্ষ্যণীয়। জিম করবেট জাতীয় উদ্যানে এরূপ একটি প্রদর্শনগ্রস্ত পুরুষ বাঘের কথা এ প্রসঙ্গে মনে এসে যাচ্ছে। উক্ত জাতীয় উদ্যানের নিকটবর্ত্তী গ্রামেরই একজন বাসিন্দা একদিন জাতীয় উদ্যানের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল—তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয় হয়। এমন সময় পার্শ্ববর্ত্তী বনাঞ্চলে তখন সেই প্রদর্শন বাতিকগ্রস্ত পুরুষ বাঘটি ছিল ও তার খানিক দূরে ছিল একটি বাঘিনী। হঠাৎ বাঘিনীকে দেখ্‌তে পেয়ে বাঘটির মনে হোল খানিকটা বীরত্ব দেখায় লোকটির উপরে। গ্রামের লোকটির মাথায় একটি সাদা পট্টি বাঁধা ছিল। ঘটনার মাসটি ছিল খুব সম্ভবতঃ সেপ্টেম্বর মাস। বাঘটি গুটিসুটি মেরে একেবারে লোকটির কাছে চলে এল। মানুষটি তখন একেবারে বাঁধনছাড়া—কি করবে বুঝতে পারছিল না। বাঘটি হঠাৎ মানুষটিকে আক্রমণ করে বসল—কিন্তু লোকটিও বুদ্ধির বলেই হোক বা অন্য কোন কারণ বশতঃই হোক মাথার পট্টিটি খুলে বাঘের কাছে ফেলে দিয়ে কাছের একটা গাছে ওঠার চেষ্টা করল। পট্টিটি দেখে বাঘ কিন্তু থমকে দাঁড়াল ও মানুষটি সে সুযোগে হাত পা শরীর জখম

করেও গাছে উঠে গেল। বাঘটিও নাছোড়বান্দা—সেও তখন মানুষটির পিছু নিয়েছে ও পেছনের পায়ে ভর দিয়ে লোকটিকে তার থাবার আঘাত দিতে চেষ্টা করল। এ সবই ঘট্‌ছে বাঘিনীটির চোখের সামনে। কারণ বাঘিনীটি এ সব ঘটনা দেখ্‌ছে কিনা সেটা পুরুষ বাঘটি গিয়ে গিয়ে দেখে আস্‌ছিল। বাঘটি কিন্তু লোকটিকে কিছুতেই ধরতে পারল না—কারণ ততক্ষণে লোকটি গাছের মগডালে উঠে গেছে। তখন বেচারা বাঘ আর কি করে। তার থাবার আচড়ে গাছটিকেই ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল ও মুখের নানা অঙ্গভঙ্গি করে কপট বীরত্ব দেখাতে লাগ্‌ল। এর পরে অবশ্য বাঘটি ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঘিনীর উপরে ও নিকটবর্ত্তী নালার ধারে চলে গিয়ে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিমায় যৌনমিলনে লিপ্ত হোল। কিন্তু বাঘটি মাঝে মাঝে এসে গাছের তলায় দেখ্‌তে থাক্‌ল লোকটিকে যে কিনা ফাঁকি দিয়ে তার হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছে। ইতিমধ্যে সূর্য্য ডুবে গেছে—জিম করবেট জাতীয় উদ্যানে নেমেছে রাত্রির অন্ধকার। হতভাগ্য মানুষটির কি করুণ অবস্থা তখন—অনাহারে, অনিদ্রায় বস্ত্রহীন হয়ে রাত্রিকালে গাছের উপরে রাত কাটানর জন্য তৈরী হল। হতভাগ্য মানুষটির কাছে সে রাত্রিকে জীবনের দীর্ঘতম রাত্রি বলে মনে হতে লাগ্‌ল—সময় যে আর কাটে না। কখন দিনের আলোয় সে সব কিছু দেখ্‌তে পাবে এটাই তার কাছে সবচেয়ে বড় প্রার্থনা। নাছোড়বান্দা পুরুষ বাঘটি কিন্তু মাঝে মাঝে এসে এসে দেখ্‌তে লাগ্‌ল লোকটিকে ও বিরক্ত হয়ে আওয়াজ করে আবার চলে যাচ্ছিল। অবশেষে রাত্রির অমানিশা কেটে দিন হল—বাঘে মানুষের লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত মানুষই জিতল। কারণ পরের দিন ভোরবেলা সেখান থেকে একটি ঠেলা গাড়ি যেতে দেখে লোকটি চীৎকার করে তাকে থামিয়ে দিল। পুরুষ বাঘটি ততক্ষণে বেপাত্তা। সে গ্রামের বাসিন্দাদের কাছ থেকে জানা গেল যে সে বাঘটি নাকি সে বনাঞ্চলে বেশ কিছুদিন ছিল হয়ত আবার সে হতভাগ্য পট্টিধারীকে সামনে পাবে সে আশায়। অবশ্য সে বাঘটি অন্য কোন মানুষের ক্ষতি করেনি এর পরে। এর পরের ঘটনা আরও মর্মান্তিক। পট্টিধারী মানুষটি সেদিন বাঘের মুখ থেকে বেঁচে চলে গিয়েই জ্বরে পড়ে গেল ও তার সে জ্বর আর কম্‌ল না। দিন দশেকের মধ্যেই হতভাগ্য মানুষটি মারা গেল। হয়ত অপরিসীম উত্তেজনাই এ মৃত্যুর জন্য দায়ী।

বাচ্চা জন্মাবার আগেই বাঘ ও বাঘিনী আলাদা হয়ে যায়। এর পরে যখন বাচ্চা হয় তার পর থেকে বছর দুই পর্যন্ত বাচ্চারা মা বাঘিনীর সঙ্গে থাকে—তবে এ ব্যাপারেও কিছু কিছু ব্যতিক্রম ভারতবর্ষের বিভিন্ন বনে লক্ষ্য করেছি।

পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে মনে হয় কোনও প্রাণী বেশ আগে থেকেই স্বাধীনভাবে থাক্‌তে অভ্যস্ত হয়ে যায়—বাঘের বাচ্চারাও এর ব্যতিক্রম নয়। মা বাঘিনী বাচ্চা নিয়ে কোনও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়লে অবশ্যই স্থান ত্যাগ করে। সুন্দরবনের নদীতে আমি বেশ কয়েকবার লক্ষ্য করেছি বাঘিনী মা ও তার দু বাচ্চা নিয়ে নদীতে সাঁতার কেটে নিজেদের আবাস-স্থল পরিবর্ত্তন করছে। বাঘিনীদের দুরবস্থার জন্য অনেকসময় বাঘও দায়ী হয়ে থাকে। দিনের পর দিন স্বাভাবিক শিকার না পেলে বা অন্য কোনও কারণে পুরুষ বাঘেরা কোন কোন ক্ষেত্রে বাচ্চাদের আক্রমণ করে ও মা বাঘিনীর তখন প্রাণান্তকর অবস্থা—সেরূপ ঘটনা সামাল দিতে গিয়ে। স্বাভাবিক বনের পরিবেশের প্রতিকূল অবস্থার জন্যই পুরুষ বাঘের এরূপ অস্বাভাবিক আচরণ। সাধারণতঃ বাঘের শিকার করার সময় সন্ধের পর থেকে শুরু হয় ও সারারাত ধরে চলে। এ সময়ের মধ্যে তারা সাধারণতঃ নদীনালার ধার দিয়ে ঘুরে বেড়ায় শিকারের খোঁজে—কখনও আস্তে কখনও বেশ জোরে। শিকার-প্রাণী চিহ্নিত করার আগে বাঘের গমনাগমনের বেগের মাত্রা খুবই ধীরে হয়ে থাকে। তবে বনের পরিবেশের উপরেও এ ধরনের শিকার পদ্ধতি অনেকাংশে নির্ভর করে। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে বহু বাঘের আচরণ কিন্তু এ স্বাভাবিক আচরণ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এখানকার মানুষখেকো বাঘেরা দিনের সময়কেও কাজে লাগায় মানুষ বা অন্যান্য স্বাভাবিক শিকারপ্রাণীর খোঁজে। কিছু কিছু বাঘ আছে এ বনাঞ্চলে যারা আবার মাঝরাতে এসে মানুষের নৌকো থেকে মানুষ তুলে নিয়ে যায়। এতই সতর্ক এদের আচরণপদ্ধতি যে ঘুমন্ত মানুষেরা বহুক্ষেত্রে জানতেই পারে না যে বাঘ তাদের নৌকোতে হানা দিয়ে তাদেরই কোনও সঙ্গীকে নিয়ে যাচ্ছে। সাধারণতঃ অন্যান্যরা বুঝতে পারে যখন বাঘ তার হতভাগ্য শিকার মানুষকে নৌকো থেকে তুলে নদীতে ঝাঁপ দেয়—তখনই সামান্য নৌকোর আন্দোলন হয়। তার আগে বাঘের আচরণ অত্যন্ত সংযত ও অত্যন্ত সন্তর্পণে শিকারের কাজ সম্পন্ন করে তাদের পছন্দকরা মানুষটিকে মুখে করে তুলে নেওয়ার মধ্যে। সাধারণতঃ রাত এগারোটার সময় এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে—জোয়ারের সময়ই এ ধরনের নৌকো থেকে মানুষ নেওয়ার ঘটনা বেশী হয় ভাটার সময় থেকে। আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করেছেন—বাঘেরা ঘুমোয় কখন? ভারতবর্ষের বিভিন্ন জঙ্গল ঘুরে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তার উপরে ভিত্তি করে বলতে পারি যে বাঘের ঘুমোবার স্বাভাবিক সময় হচ্ছে দিনের বেলা। সূর্য্য ওঠার পরেই বাঘেরা কোন গাছের বা পাহাড়ের আড়ালে নিজেদের ঘুমোবার আশ্রয় বেছে নেয়। এদের ঘুমোবারও

পদ্ধতি বিচিত্র—কখনও শরীরের একধার মাটিতে রেখে কখনও গুটিসুটি মেরে মাথাটা থাবার মধ্যে রেখে আবার কখনও চার পা আকাশের দিকে রেখে। কিন্তু এদের ঘুমোবার যে পদ্ধতিই থাক না কেন—ঘুমন্ত অবস্থায় কোনও বাঘকে শিকার করা নাকি বেশ কষ্টসাধ্য। বহু শিকারীর কাছ থেকে গল্প শুনেছি যে তারা বাঘ শিকারের আগে নাকি বাঘকে ঘুমন্ত অবস্থা থেকে জাগিয়ে দেয় ও তারপর শিকার করে। প্রখ্যাত প্রকৃতিবিদ জিম করবেটও একই কথা বলে গেছেন তাঁর গ্রন্থাবলীতে। রাইফেল থেকে গুলি করে সঠিক স্থানে লাগান নাকি বেশ মুশকিল ঘুমন্ত বাঘদের ক্ষেত্রে এটাই শিকারীদের সুচিন্তিত অভিমত। বাঘেদের একটি প্রচলিত অভ্যাস হচ্ছে ধুলো-ময়লাতে স্নান করা। বিশেষ বিশেষ পোকামাকড়ের হাত থেকে বাঁচার জন্যই বোধ হয় এ ধরনের ধুলো-স্নান করে থাকে বাঘ প্রজাতিরা। শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় বাঘেরা আবার সাধারণতঃ কোন পাহাড়ের উঁচুতে উঠে পড়ে ও সূর্য্যের আলোতে নিজের শরীরকে শুষ্ক করে নেয়। জিম করবেট জাতীয় পার্কে, কান্হা জাতীয় পার্কে, রন থম্বোর জাতীয় পার্কে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে বাঘেরা সাধারণতঃ প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় দুবার জলপানের জন্য নালার ধারে আসে গ্রীষ্মকালে। কিন্তু সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প অঞ্চলে এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করেছি। বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করে লক্ষ্য করেছি সুন্দরবনের কোন কোন বাঘ ২৪ ঘণ্টায় একবারও জলপান করেনি বা নালা-নদীর কাছে কিনারে আসেনি। সুন্দরবনে বাঘেদের আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছি যে এরা এদের নখগুলো প্রায়ই গাছের উপরে পরীক্ষা করে। নখগুলোকে পরিষ্কার রাখাই বোধহয় এদের পরীক্ষার উদ্দেশ্য। তবে এ ধরনের পরীক্ষা সমগ্র ব্যাঘ্র প্রজাতির পক্ষে খাটে না—কোনও বিশেষ বিশেষ প্রাণী এরূপ পরীক্ষা করে থাকে—কারণ গাছের উপরে একই রকমের নখের দাগ লক্ষ্য করা যায়—বিভিন্ন প্রকারের নয়। মেলঘাট ব্যাঘ্র প্রকল্প অঞ্চলের একটি মহুয়া গাছের কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে। গাছটিতে কোন একটি বাঘের নখের দাগ প্রায়শঃই দেখা যায়। কিন্তু সে বনে মাইলের পর মাইল অন্য কোনও গাছে সেরূপ নখের দাগ দেখিনি। বাঘের মলত্যাগ করার পদ্ধতিও বেশ চিত্তাকর্ষক ও অভিনব। জঙ্গলের মধ্যে কখনও তারা এ কাজ করে না। জঙ্গল ভাল ভাবে পরিষ্কার করে ১ ফুট × ৬ ইঞ্চি জায়গা তৈরী করে তাতেই তারা মলত্যাগ করে। বলা বাহুল্য এ ধরনের অভ্যাস সত্যি সত্যিই বেশ স্বাস্থ্যসম্মত ও বাঘেরা স্বভাবের দিক থেকে বেশ পরিষ্কার থাক্‌তেই বিশ্বাসী। কোনও প্রাণীকে শিকার করে ও তার মাংস খাওয়া শেষ করে বাঘেরা দাঁত দিয়ে তাদের শরীর পরিষ্কার করে

থাকে। বাঘের এ ধরনের মানবিক আচরণ সত্যি সত্যিই বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। শিকার করার পর বাঘের মাংস খাওয়ার ধরণও অন্যান্য জন্তুদের থেকে আলাদা ও শিকার প্রাণীর মাংস খাওয়ার ধরন থেকে সহজেই বোঝা যায় যে শিকারকর্ত্তা বাঘ বা অন্য কোন খাদক প্রাণী। বাঘ সাধারণতঃ কোন জন্তু শিকার করে প্রথমেই তার পেছনের অংশ বেছে নেয় খাওয়ার জন্য ও তার পর পাকস্থলী টেনে বের করে নেয়—তারপর শরীরের অন্যান্য অংশ। কিন্তু চিতাবাঘের খাওয়ার ধরনধারণ সম্পূর্ণ পৃথক। চিতাবাঘ প্রথমেই কোনও জন্তু শিকার করে তার শরীরের ভেতরের অংশগুলো আগেই খেতে উদ্যত হয়—যথা হৃদয়, যকৃৎ, ফুসফুস প্রভৃতি ও ভেতরের অংশ খাওয়া শেষ হলে তারা বাইরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি খেতে থাকে। তবে বনের পরিবেশ ও শিকার প্রাণীর অবস্থাভেদে প্রায়শঃই খাদক প্রাণীরা তাদের শিকার পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে শিকারোত্তর ভোজন পদ্ধতিরও পরিবর্ত্তন ঘটায়। খাদক প্রাণীদের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হচ্ছে যে তারা ভোজন পর্ব সমাধা করে কোনও জলের নালার কাছে যায় জল পানের উদ্দেশ্যে।

পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের বনাঞ্চলে যে দুটি ম্যানগ্রোভ বৃক্ষ প্রজাতি বাঘের নখের দ্বারা আক্রান্ত হতে দেখেছি—তা হল কেওড়া ও ধুন্দল। বাইন গাছেও নখের চিহ্ন লক্ষ্য করেছি। কিন্তু এখানেও আক্রমণের পদ্ধতির মধ্যে প্রাণীর বৈশিষ্ট্যই লক্ষ্য করেছি অর্থাৎ ব্যাঘ্রপ্রজাতি মাত্রেই যে সকল প্রাণী এ ধরনের নখের আঁচড় দিতে অভ্যস্ত সেটি মোটেই নয়—কোনও বিশেষ প্রাণী এ জাতীয় নখের আঁচড় দিয়ে থাকে মাত্র। আবার কোন কোন বাঘ কোনও বিশেষ গাছে আঁচড় কাটতে পছন্দ করে—যেমন সুন্দরবনে দেখেছি যে পুরুষ বাঘেরা সাধারণতঃ ধুন্দল গাছে আঁচড় বেশী কাটে কিন্তু বাঘিনীদের পছন্দ কেওড়া ও বাইন। এ ধরনের পছন্দের কারণগুলো এখনও সঠিকভাবে জানা যায়নি। শিকার প্রাণীর ভুক্ত দেহ বিভিন্ন বনাঞ্চলে পরীক্ষা করার পর এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে বাঘ শিকার প্রাণীর মাথার খুলিটি বাদ দিয়ে সমস্ত কিছুই খেয়ে ফেলে। কিন্তু অন্যান্য খাদক প্রাণীর ক্ষেত্রে এ ধরনের মন্তব্য খাটে না।

মানুষখেকো বাঘ নিয়ে বহু ভাবনা চিন্তা চলছে—কিন্তু কোনও বাঘের মানুষখেকো হওয়ার সঠিক কারণগুলো ভাল ভাবে জানা দরকার। তার কারণ বাঘের মানুষখেকোতে পর্যবসিত হওয়ার কারণ এক এক পরিবেশে এক এক রকম। এক এক বনাঞ্চলে এক এক রকম। কোথাও শিকার প্রাণীর অভাব, কোথাও বৃদ্ধ বয়সে শিকার প্রাণী গ্রহণে অপারগ হওয়া ইত্যাদি। জিম করবেট তার 'ম্যানইটার্স অফ কুমায়ুন' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিশদভাবে ঘটনা সহযোগে

পাখী ও হরিণ একসঙ্গে জলপান করছে
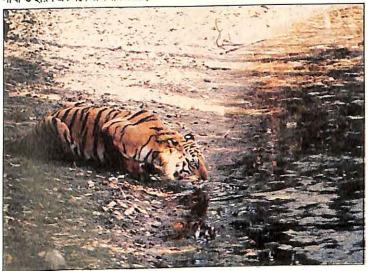
সুন্দরবনের বাঘ সাঁতারে ব্যস্ত

আলোচনা করেছেন। কিন্তু এটা ঠিক যে কোনও বিশেষ বনাঞ্চলে সমস্ত কারণগুলো সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। কোন কোন বনাঞ্চলে আবার মানুষখেকো হওয়ার কারণ অন্যান্য প্রচলিত ও জনপ্রিয় কারণগুলো থেকে আলাদা। সুন্দরবনের কথাই ধরা যাক না কেন। এখানকার মানুষখেকো বাঘ বোধহয় অন্যান্য মানুষখেকো বাঘ থেকে পৃথক—কারণ মানুষখেকো হওয়ার কারণ এ বনাঞ্চলে অন্যরকম। আমার নিজের ব্যক্তিগত ধারণা হচ্ছে যে এখানে মানুষ হচ্ছে এ বনের সবচেয়ে সহজতম ও স্বল্পায়াসলভ্য শিকার। আর তাই বোধহয় মানুষখেকো হওয়ার প্রধান কারণ। শিকারপ্রাণীর বৈচিত্র্যের অভাবও এ অঞ্চলে মানুষখেকো হওয়ার অন্য বিশেষ কারণ। মানুষকে তাই মানুষখেকো বাঘ থেকে বাঁচাতে হলে মানুষকেই তার জীবনধারণের পদ্ধতি পাল্টাতে হবে। কেউ কেউ যন্ত্রচালিত ব্যাটারীর সাহায্যে আবার বাঘের চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা চালাচ্ছে। এগুলোর কোনও বৈজ্ঞানিক মূল্য আছে বলে মনে হয় না—অবশ্য কিছু লোককে চমকানোর মূল্য থাকতে পারে। আমি আমার কিছু জনপ্রিয় নিবন্ধে এ ধরনের হাস্যকর প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখের কথা এ ধরনের অপচেষ্টা এখনও অল্পবিস্তর চলছে। কেউ কেউ আবার বলে বেড়াচ্ছেন যে এ ধরনের ব্যাটারী বাহিত শক্তির সাহায্যে বাঘ মানুষ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে তাই নাকি কোন কোন বনাঞ্চলে মানুষের মৃত্যুর হারও কমেছে। তারা বাস্তব অবস্থা খতিয়ে না দেখেই এ ধরনের বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচার করছেন—তাতে বাঘ ও মানুষ কারুরই কোনও মঙ্গল সাধন ত করছেই না বরং উভয়ই এ ধরনের প্রচেষ্টায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

বিগত পাঁচ হাজার বছর ধরে মানুষ বাঘ হত্যা করেছে। বড় শিকারীদের মধ্যে ব্যাঘ্র হত্যার অশুভ প্রতিযোগিতা এ প্রাণীটিকে ক্রমশই কোণঠাসা করছিল। রাজা-মহারাজা, উর্ধ্বতন সামরিক ও অসামরিক রাজকর্মচারী এ অশুভ প্রতিযোগিতার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। সে সময় বাঘ শিকার ছিল সামাজিক আভিজাত্যের মাপকাঠি। উদয়পুরের মহারাজা অন্ততঃ এক হাজার বাঘ শিকার করেছেন, সুরগুজার মহারাজা নিজেই এক হাজার পঞ্চাশটি বাঘ শিকার করেছেন বলে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন। ভারতবর্ষের প্রায় সকল রাজা মহারাজাই তাদের ১০ থেকে ১২ বছর বয়সের মধ্যে প্রথম বাঘ শিকার করেছেন বলে জানা যায় ও এ শিকার বৃদ্ধ বয়স অবধি নিরন্তর চলেছে যতদিন পর্যন্ত বন্দুক ব্যবহারের ক্ষমতা বজায় রয়েছে। ব্রিটিশ অফিসারদের মধ্যে খুব কমই ছিলেন যিনি ভারতবর্ষে চাকুরী করার সময়ে একটি বাঘও শিকার করেননি। কারুর কারুর শিকার করার

পদ্ধতিও ছিল বিচিত্র। মাচানের নিরাপদ স্থানে বসে টেলিস্কোপিক রাইফেল দিয়ে বাঘ শিকার করেছেন অনেক ব্রিটিশ অফিসার—এরূপ শিকারে না আছে সাহস না আছে কোন উত্তেজনা ও সামান্যতম ঝুঁকি পর্যন্ত নেই। কারণ বাঘ শিকারের প্রাথমিক কাজগুলো—অর্থাৎ জঙ্গল সাফ করা মাচান বাঁধা ও এমনকি বীর (?) শিকারীদের সঙ্গে মাচানে বসা সবই আজ্ঞাবহদের দ্বারাই সম্পন্ন হ'ত। এর ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। ১৯২০ সালে ভারতবর্ষে যেখানে প্রায় ৪০ হাজার বাঘ ছিল ১৯৪০ সালে সেটা কমে দাঁড়িয়েছে ৩০ হাজার, ১৯৬০ সালে ১৫ হাজার ও ১৯৭২ সালে মাত্র ১৮০০। তাই 'ব্যাঘ্র প্রকল্প' তৈরী হল এ দ্রুত ক্ষয়িষ্ণু ব্যাঘ্র প্রজাতিকে কালের করাল গ্রাস থেকে উদ্ধার করার সর্বাত্মক প্রয়াস নিয়ে। ফলও পাওয়া গেল। ১৯৮৪ সালে বাঘের সংখ্যা বেড়ে হল ৩৫০০।

বাঘের সংখ্যার ক্রম অবনতির একমাত্র কারণ অবশ্য বাঘ শিকার নয়—বাঘের আবাস-স্থল হ্রাস, বাঘের স্বাভাবিক শিকার প্রাণীর সংখ্যা হ্রাস ও সব মিলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় না থাকাই হচ্ছে বাঘের সংখ্যা হ্রাসের কারণ। তাই প্রাকৃতিক ভারসাম্য সুষ্ঠুভাবে বজায় রাখার মধ্যেই সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজতে হবে। কিছু কিছু বাঘের মানুষ শিকারের স্বভাব এ প্রাণীটিকে মানুষের কাছে ভীতিবিহ্বল শত্রু হিসেবে পরিগণিত করেছে। কিন্তু এ ধারণা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ কারণ একজনের অপরাধের জন্য হাজার প্রাণীকে দোষী করা উচিত নয় আর আমরা যদি মানুষখেকোর অভ্যাস গ্রহণ করার কারণগুলো অনুসন্ধান করি তবে দেখা যাবে যে বাঘের মানুষ খেকো হওয়ার কারণও বহুলাংশে মনুষ্য সৃষ্ট। অর্থাৎ আমরা মানুষেরা নিজের অপরাধের জন্য অন্য নিরপরাধ প্রাণীকে দোষী হিসেবে সাব্যস্ত করছি। স্বাভাবিকভাবে বাঘের মানুষখেকো স্বভাব গ্রহণ করার কারণ হচ্ছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় না থাকা—যার জন্য মানুষই বহুলাংশে দায়ী। বাঘের মানুষ খাওয়ার পরিসংখ্যানও অবশ্য বিচিত্র। মধ্য প্রদেশে কেবলমাত্র মান্‌ডলা জেলাতেই ১৮৫৬ সালে ২০০ জনেরও বেশী গ্রামবাসী মানুষখেকোর খাদ্যে পরিণত হয়েছিল। প্রকৃতিবিদ্ স্টুয়ার্ট বেকারের ১৮৯০ সালের বিবরণ থেকে জানা যায় কিভাবে একটি বাঘ একটি জনবহুল রাস্তার দখল নেয় ও যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দিতে সাহায্য করে। ভারত সরকারের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে ১৯০২ সালে ১০৪৬ জন মানুষ মানুষখেকো বাঘের শিকার হয়েছিল। জিম করবেটের বিভিন্ন বিবরণেও মানুষখেকোর বিচিত্র কাহিনী জানা যায়। একটা ভ্রান্ত ধারণা বহুলোকের মধ্যেই রয়েছে যে সুন্দরবনের বাঘ একটি বিশিষ্ট প্রজাতির ও তার

নাম নাকি 'রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার' ,এ ধারণাটি কিন্তু পুরোপুরি ভ্রান্ত। সুন্দরবনের বাঘ ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের বাঘের থেকে কোন ক্রমেই ভিন্ন প্রজাতির নয় ও তার নাম 'রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার' ও নয়—জীব বিজ্ঞানীদের মতে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার নামটি বিজ্ঞান. প্রসূত নয়। এ প্রসঙ্গে বাঘের অন্যান্য প্রজাতি (৮টি প্রজাতি) সম্পর্কে একটু আলোচনা করা যাক্।

বাঘের প্রজাতি		বর্তমান সংখ্যা (আনুমানিক)
সাইবেরিয়ার বাঘ	....	১৩০
চীনা দেশীয় বাঘ	....	কতিপয়, সংখ্যা জানা নেই
ইন্দো-চীন বাঘ	....	২০০০
ভারতবর্ষীয় বাঘ	....	৩৫০০
কাস্পিয়ান বাঘ	....	অস্তিত্ব বিলোপ হওয়ার পথে
সুমাত্রান বাঘ	....	৪০০ থেকে ৫০০
জাভাদেশীয় বাঘ	....	৫ থেকে ১০-এর মধ্যে
বালি দেশীয় বাঘ	....	অস্তিত্ব বিলুপ্ত

বাঘ পৃথিবীর আপামর জনসাধারণের কাছে শৌর্য, বীর্য, সাহসিকতা, শ্রদ্ধা ও ভীতির এক অনিন্দ্যসুন্দর ও অভিনব সংমিশ্রণ হিসাবে পরিচিত। সিন্ধু উপত্যকার মহেঞ্জোদাড়ো থেকে সীলের যে সবচেয়ে পুরানো ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া গেছে খৃষ্টপূর্ব ২৫০০ -এর,তাতে বাঘের চিত্র খোদাই করা ছিল বলে জানা যায়। কোরিয় দেশীয়রা বাঘকে প্রাণীজগতের রাজসিংহাসনে বসিয়েছে, সাইবেরিয়ার জনগণের সংস্কৃতিতে বাঘ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। চীনের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে বাঘের সম্পর্কও অতি প্রাচীন—তারা তাদের শিল্পে ও চিত্রাবলীতে বাঘকে ধরে রেখেছে ভিন্ন ভিন্ন চিত্রগাথায়। 'মুরাল' চিত্রগুলো এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতেও এই প্রাণীর এক বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ও তার অব্যবহিতপূর্বে ব্যাঘ্রকুল এক বিরাট ও বিস্তৃত ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ ছিল—পূর্ব তুর্কের পর্বতমালা ও কাস্পিয়ান সাগর থেকে শুরু করে রুশদেশীয় মাঞ্চুরিয়া পর্যন্ত। পূর্বপ্রান্তে আফগানিস্তানের উত্তরভাগ থেকে শুরু করে ইরান ও সোভিয়েত রাশিয়া পর্যন্ত এই প্রাণীর ব্যাপ্তি। উত্তর প্রান্তে বাঘ কোরিয়া, চীনের পূর্বভাগ ও বোর্নিয়ো ছাড়া হংকং,

সিঙ্গাপুর, জাভা, সুমাত্রা দ্বীপপুঞ্জ সমেত সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই প্রাণীর অস্তিত্ব বিদ্যমান ; হিমালয়ের বরফ আচ্ছাদিত পর্বতমালা, থরের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত মরুভূমি ও সিংহল দ্বীপ ব্যতিরেকে ভারত-উপমহাদশের সর্বত্র ব্যাঘ্রকুলের বিরাজ অব্যাহত ছিল। ভারতবর্ষে ইরিয়ানার জঙ্গলে, রাজস্থান ও গুজরাটের বনভূমিতে বাঘের অস্তিত্ব বিদ্যমান। দক্ষিণ ভারতে মহীশূর, অন্ধ্রপ্রদেশ তামিলনাড়ু ও কেরালায়ও এই প্রাণীর উপস্থিতি ছিল।

বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের বনভূমিও বাঘের অত্যন্ত প্রিয় আবাসস্থল। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন ও উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চল বাঘের অতি মনোরম আবাস ক্ষেত্র। উত্তরখণ্ডের চিরসবুজ ও অন্যান্য বনাঞ্চল বাঘের উপযুক্ত আবাসরূপে পরিচিত। পূর্ব থেকে পশ্চিমের গাঙ্গেয় উপত্যকা ও হিমালয়ের পাদদেশ জুড়ে যে বিস্তৃত বনাঞ্চল রয়েছে তা ভারতবর্ষের ব্যাঘ্র আবাসস্থল রূপে সমধিক পরিচিত।

সুন্দরবনের বাঘ বিশ্বের ব্যাঘ্র মানচিত্রে এক, অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে। ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানীদের মতে সুন্দরবনের উৎপত্তি তুলনা-মূলকভাবে আধুনিক। এমনকি দু থেকে তিন হাজার বছর আগে পর্যন্ত এ অঞ্চল জলের গহ্বরে নিমজ্জিত ছিল বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে গঙ্গার মূল প্রবাহ ভাগীরথী থেকে ভৈরব ও তারপর পদ্মায় পরিবর্তিত হওয়ার ফলে সুন্দরবনে ব-দ্বীপের উৎপত্তি হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের এক অতি নিবিড় সম্পর্কের এক বিরাট অথচ প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এই সুন্দরবন। বিশ্বমানবের সেবায় উৎসর্গীকৃত এই সুবিশাল বনভূমি প্রকৃতির সুশৃঙ্খল ও সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রেখে চলেছে। ভয়াল সুন্দর বাঘ, পৃথিবীর বৃহত্তম কুমীর, বিষধর সাপ, হাঙর কামট, বি‍ভিন্ন জাতি ও প্রজাতির শামুক, কাঁকড়া, মাছ বন্যবরাহ, ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও প্রজাতির বিহঙ্গ, অনিন্দ্যসুন্দর হরিণ-শাবক সুন্দরবনকে বিশ্বের মানচিত্রে অদ্বিতীয় করেছে।

কিন্তু এই সুন্দরবনে ব্যাঘ্রকূলের আবির্ভাবের কারণ ও পদ্ধতি কি ? ঐ প্রশ্ন প্রকৃতি বিজ্ঞানী বা অন্যান্য কৌতূহলী বিজ্ঞানী ও মানুষের মনে উঁকিঝুঁকি দিতে পারে। ব্যাঘ্রকুলের সুন্দরবনে আবির্ভাবের সম্ভাব্য কারণ হিসাবে দুটো ভিন্ন ভিন্ন মতামত আছে। গঙ্গা অথবা ব্রহ্মপুত্র বা তাদের অজস্র শাখানদীর জলরাশির সাহায্যে ব্যাঘ্রকুল বঙ্গোপসাগরের এক বিরাট খাঁড়ি সুন্দরবনে আশ্রয় নিয়েছে ও এর অখণ্ড, সুবিশাল ও ব্যাপ্ত বনভূমিকে আবাসস্থল হিসাবে গ্রহণ করেছে। অন্য একটা মত হচ্ছে এই যে, যেহেতু সুন্দরবনের উৎপত্তি দুই বা তিন হাজার বছরের

মতো (ভূতত্ত্ববিদ্‌দের মতে), সেহেতু ব্যাঘ্রকুলের সুন্দরবনে উৎপত্তির ঘটনা ভারতবর্ষের অন্যান্য স্বাভাবিক বা উপযুক্ত আবাসস্থল অপেক্ষা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগে উত্তর এশিয়া থেকে ভারতবর্ষ যে ব্যাঘ্রকুলের উৎপত্তিস্থল সে ব্যাঘ্রকুল তার স্বাভাবিক আবাসস্থল, খাদ্য বা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনীয়তার যোগান যেখানেই পেয়েছে সেখানেই প্রকৃতির সুনির্দিষ্ট নিয়মে আশ্রয়স্থল গড়ে তুলেছে। সুন্দরবন তাই ব্যাঘ্রকুলের নতুন গড়ে ওঠা আশ্রয়স্থলের মধ্যে একটা। পরিবর্তনশীল বনভূমি বা তার জলরাশির ক্রমবর্ধমান লবণাক্ততার সাথে সাথে পরিবেশের পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে ; ব্যাঘ্রকুলকেও ঐ পরিবর্তিত পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে হচ্ছে। এই ব্যাঘ্রকুল 'রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার' নামে সর্বসাধারণের কাছে পরিচিত। কিন্তু 'রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার' এরূপ নামের কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা মেলেনি। যুগ যুগ ধরে ব্যাঘ্রকুল কি শিশু, কি যুবা কি বৃদ্ধ সকলেরই সমান কৌতূহলের বস্তু। কিন্তু এই প্রাণীকুলের আহার্য, আবাসস্থল প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর ওপরে আমরা চরম অবহেলার পরিচয় দিয়েছি। নিজেদের খেয়ালখুশি চরিতার্থ করার তাগিদে মানুষ নির্বিচারে এই প্রাণীকে শিকার করেছে—তার ফলশ্রুতি রূপে প্রকৃতির স্বাভাবিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়েছে। তাইতো আজ ব্যাঘ্র প্রকল্প তৈরি হলো প্রকৃতির এক অপরূপ সৃষ্টিকে তার নিশ্চিত অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করার সঙ্কল্প নিয়ে। ব্যাঘ্রপ্রকল্প তাই কেবলমাত্র বাঘকে বাঁচানোর প্রকল্প মাত্র নয়, এটা বস্তুতপক্ষে একটা 'প্রকৃতি বিজ্ঞান' প্রকল্প যার মাধ্যমে প্রকৃতির সুষ্ঠু ও অপরিহার্য ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব। কারণ জীববিজ্ঞান রূপ পিরামিডের শীর্ষবিন্দুতে রয়েছে এই বাঘ। কাজেই এই প্রাণীর বিজ্ঞান ভিত্তিক সংরক্ষণের প্রয়োজন হচ্ছে। এই প্রাণী যে সকল প্রাণীর ওপর নির্ভরশীল তাদের সুষ্ঠু সংরক্ষণ অর্থাৎ উদ্ভিদ ও প্রাণীজগৎ নিয়ে সৃষ্ট এই বিরাট ও জটিল সুশৃঙ্খল প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার মধ্যেই ব্যাঘ্র প্রকল্পের সাফল্য নির্ভর করছে। মানুষের ক্ষমাহীন অবহেলার ফলে এক সময় চরম মূল্য দিতে হয়েছিল যখন জাভাদেশীয় গণ্ডার ও বন্যমহিষ সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে লুপ্ত হলো। সুন্দরবনের বাঘকে যাতে সেই অবহেলার যূপকাষ্ঠে বলি হতে না হয় তারই বলিষ্ঠ এক পদক্ষেপ এই ব্যাঘ্র প্রকল্প।

সুন্দরবনের বাঘ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা হচ্ছে যে, বাঘ নাকি জন্মসূত্রেই মানুষখেকো। কিন্তু এই ধারণা যে অভ্রান্ত নয় পরিসংখ্যানভিত্তিক বিশ্লেষণে তার প্রমাণ মেলে। একটা পরিসংখ্যানভিত্তিক সমীক্ষার ভিত্তিতে ব্যবহারগতভাবে সুন্দরবনের বাঘকে কয়েকভাগে বিভাজন করা সম্ভব হয়েছে।

তা হলো :

১। পুরোপুরি ও মতলববাজ মানুষখেকো—সুন্দরবনের বাঘের শতকরা ২৫ ভাগ এ পর্যায়ভুক্ত। এরা মানুষ দেখা মাত্রই ছুটে যায় ও আক্রমণ করে। মনুষ্য মৃত্যুর শতকরা ৭০ ভাগ এই শ্রেণীভুক্ত বাঘের দ্বারা সংঘটিত হয়।

২। মতলবহীন মানুষখেকো—সুন্দরবন বাঘের শতকরা মাত্র ১৫ ভাগ এই পর্যায়ভুক্ত। যখন মানুষ ব্যাঘ্রকূলের আবাসস্থলে এসে উপদ্রব করে তখনই কেবলমাত্র আক্রমণ করে। মনুষ্য মৃত্যুর শতকরা ২০ ভাগ এই শ্রেণীভুক্ত বাঘের দ্বারা সংঘটিত হয়।

৩। অবস্থাভেদে মানুষখেকো—সুন্দরবনের বাঘের শতকরা ৬০ ভাগ এই পর্যায়ে পড়ে। এই সমস্ত বাঘের মানুষ খাওয়ার প্রবৃত্তি আবাসস্থলের অবস্থার ওপরে অনেকাংশে নির্ভর করে। স্বাভাবিক শিকারের অভাব বা শিকার-প্রাণী গ্রহণের অক্ষমতা বা অন্যান্য ঘটনার জন্য এই পর্যায়ভুক্ত বাঘেরা মানুষকে আক্রমণ করতে বাধ্য হয়। এরাই নিজেদের আবাসস্থল ত্যাগ করে লোকালয়ে আসে ও গবাদি পশু ও মানুষ শিকার করে। মনুষ্য মৃত্যুর শতকরা ১০ ভাগ এই শ্রেণীভুক্ত বাঘের দ্বারা সংঘটিত হয়।

ভিন্ন ভিন্ন তথ্য ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলী পর্যালোচনায় যা দেখা যায় তা থেকে কোনও বাঘের নরখাদক হওয়ার কারণগুলো হলো :

১। শারীরিক দুর্বলতা, বৃদ্ধ বয়স প্রভৃতির জন্য স্বাভাবিক শিকার ও খাদ্য গ্রহণে অপারগ হওয়া (করবেট, ১৯৫৭ ; পাওয়েল, ১৯৬৭)।

২। অন্যান্য শিকার খাদ্যের অভাব হওয়া (টারনার ১৯৫৯)।

৩। পিতামাতার কাছ থেকে মানুষ খাওয়ার অভ্যাস বংশানুক্রমে পাওয়া (অ্যানডারসান, ১৯৫৪) ;

৪। অনিচ্ছা বা অবস্থাভেদে কোন মানুষকে মারার পর তার মাংসের স্বাদ ভালো লাগা (করবেট, ১৯৫৭)।

৬। পড়ে থাকা মানুষের মৃতদেহ পরিষ্কার করার পরে সেই জীবন্ত প্রাণীর ওপরে নজর পড়া, (টেলর, ১৯৫৭)।

বাঘকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে তিনটে মৌলিক উপাদান প্রয়োজন। যথেষ্ট আশ্রয়স্থল, যথেষ্ট অলবণাক্ত জল ও যথেষ্ট শিকার-প্রাণী। সুন্দরবনে যথেষ্ট আশ্রয়স্থল ও শিকার-প্রাণীর অভাব নেই কিন্তু অলবণাক্ত জলের নিতান্তই অভাব। অলবণাক্ত জল যেটুকু পাওয়া যায় সেটা হলো বৃষ্টির জল এবং তাও একটা বিশেষ সময়ে। পরিসংখ্যান-ভিত্তিক গবেষণায় নিম্নলিখিত তথ্যগুলো

সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায়—

১। সুন্দরবনের বাঘের মানুষ খেকো অভ্যাস ও ভয়াবহতার সঙ্গে জলের লবণাক্ত ভাগ ও জোয়ারের জলের ওঠানামার একটা ধনাত্মক, স্পষ্ট ও নিশ্চিত সম্পর্ক রয়েছে ;

২। মানুষখেকো স্বভাব এবং উদ্ভিদ ও প্রাণী সমূহের বৈচিত্র্যের সঙ্গে একটা ঋণাত্মক বা বিপরীতধর্মী সম্পর্ক পাওয়া গেছে ;

৩। সুন্দরবনের নদীনালার জলে প্রচুর পরিমাণে লবণ থাকায় এবং সেই লবণাক্ত জল বাঘ গ্রহণ করার ফলেই যকৃৎ ও মূত্রনালীর পরিবর্তনের মাধ্যমে হয়ত ওদের শরীরে পরিবর্তন আসতে পারে।

সুন্দরবনে নদী নালায় জোয়ার ভাটার ওঠানামা সমগ্র উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের ওপরে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। পরিসংখ্যান-ভিত্তিক সমীক্ষায় দেখা যায়—জোয়ার ভাটার ওঠানামার সঙ্গে উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের ব্যবহারগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কযুক্ত ; যা পরবর্তী বর্ণনার মাধ্যমে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ব্যাঘ্রকুলের মনুষ্য শিকার সম্পর্কীয় গবেষণায় কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায় তা হলো :

১। ৩৬ থেকে ৪৫ বছর পর্যন্ত মানুষের বাঘের হাতে মৃত্যুর হার সর্বাধিক। তবে কি বাঘ সবচেয়ে সবল লোককে আক্রমণ করে ? এ সম্পর্কে আরও গবেষণার প্রয়োজন।

২। এপ্রিল মাসে সবচেয়ে বেশি মানুষের মৃত্যু ঘটে। এর কারণ সুন্দরবনে মধু সংগ্রহ শুরু হয় এপ্রিল মাসে ও এ মাসেই মধু সংগ্রহকারীরা সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় বনে যায়।

৩। সকাল ৬টা থেকে ৮টা ও বিকেল ৩টা থেকে ৫টার সময় মানুষের মৃত্যুর হার দিনের অন্যান্য সময় অপেক্ষা বেশি হয়। কারণ, এই দুই সময়েই কাঠুরে, মৌলী, জেলে প্রভৃতি হয় বনে প্রবেশ করে অথবা বন থেকে বেরিয়ে যায়। মানুষের ব্যবহারগত বৈশিষ্ট্য, আচার আচরণ ও প্রকৃতিগত গুণাবলী সম্পর্কে বাঘের সম্যক জ্ঞান থাকায় এই প্রাণী মানুষের সব থেকে দুর্বল মুহূর্তকেই বেছে নেয় আক্রমণ করার সময় হিসাবে। তাই হয়ত রাত ১১টার সময়ই বাঘেরা নৌকায় থাকা মানুষকে আক্রমণ করার সবথেকে প্রকৃষ্ট সময় হিসাবে বেছে নিয়েছে। কারণ জেলে, মৌলী বা কাঠুরেরা রাত ১১টায় গভীর নিদ্রার মধ্যে থাকে বাঘেরা বোধ হয় সেটা উপলব্ধি করেই এই পন্থা অবলম্বন করে।

সুন্দরবনের জলকাদা ও অসংখ্য শূলোয় ভরা, জঙ্গল ব্যাঘ্রকুলকে দৈর্ঘ্যের

দিক থেকে অপেক্ষাকৃত খর্বাকৃতি প্রাণী হিসাবে গড়ে তুলেছে। বাঘেরা সাধারণতঃ রাত্রে শিকার করায় অভ্যস্ত। কিন্তু সুন্দরবনের বাঘ এর ব্যতিক্রম। মনুষ্য শিকারের ক্ষেত্রে সুন্দরবনের বাঘ রাত অপেক্ষা দিনেই বেশি শিকার করে ; দেখা গেছে রাতের মনুষ্য শিকার মোট শিকারের শতকরা প্রায় ১২ ভাগ। সুন্দরবনের বাঘ অত্যন্ত বুদ্ধিমান, চতুর, সাঁতারে দক্ষ ও মানুষের আচার আচরণ সম্পর্কে অতি সচেতন। সুন্দরবনের বাঘকে মৌচাক ভেঙ্গে ফেলতে দেখা যায় ও সে সময় নাকি এরা তাদের শরীরকে বালি ও কাদা মাখিয়ে নেয় মৌমাছির আক্রমণ থেকে নিজেদের আত্মরক্ষার প্রয়োজনে। মাথার খুলি সমেত মানুষের সমস্ত হাড় খেয়ে ফেলে মানুষের শিকার সমাপ্ত করে। বৃদ্ধ বাঘের পাকস্থলী থেকে পাখির পালকও পাওয়া গেছে। সুন্দরবনের বাঘ সাধারণতঃ মানুষকে পিছন থেকে আক্রমণ করে ও ঘাড়ের দক্ষিণ দিকে প্রথমেই গভীরভাবে আক্রমণ করে, যার ফলে আক্রান্ত মানুষ সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু মুখে পতিত হয়। এরূপ ঘটনাও বিরল নয় যে, একটা বাঘ কোন একটা বিশেষ স্থানে দু থেকে তিন জন মানুষকে আক্রমণ করেছে। বাঘ মানুষের পাকস্থলী প্রথম আহার করে ও তারপরে শরীরের অন্যান্য অংশ। সমগ্র মনুষ্য শিকারের মধ্যে শতকরা মাত্র ২৮টা ক্ষেত্রে মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এই পরিসংখ্যান মানুষখেকোর ভয়াবহতার চিত্রকেই প্রকট করে তোলে—যাতে তাদের মানুষ খাওয়ার স্থির সঙ্কল্পই প্রতীয়মান হয়। সুন্দরবনের বাঘের ব্যবহারগত বৈশিষ্ট্য হলো যে, এরা স্রোতের সঙ্গে সমকোণ তৈরি করে সাঁতার কাটতে অভ্যস্ত, স্রোত যতই শক্তিশালী হোক না কেন। আর কোন মৃতদেহ মাটিতে পোঁতা হলেও তা অনাবৃত করে ভক্ষণ করার নজিরও সুন্দরবনের বাঘের আছে। সুন্দরবনে গড়ে ১০ কিলোগ্রামের মতো মাংস একটা পূর্ণবয়স্ক বাঘের প্রয়োজন। সুন্দরবন বাঘের একটা অত্যন্ত অভিনব ব্যবহারগত বৈশিষ্ট্য এই যে, এরা নতুন নতুন পরিবেশের সঙ্গে নিমেষে খাপ খাইয়ে নেওয়ায় এক অপূর্ব ক্ষমতার অধিকারী—যে গুণ এদেরকে তার স্বকীয় অস্তিত্ব বজায় রাখতে বিশেষভাবে সহায়তা করে। তাই মানুষের আহার্যের অনুপযোগী ভীষণ লবণাক্ত জল গ্রহণ করেও তীক্ষ্ণ শূলোয় ভরা সুন্দরবন জঙ্গলে নিজের স্বকীয়তা স্বগর্বে প্রকাশ করা চলেছে। এর সঙ্গে যদি মানুষের সহনশীলতা ও বিচারবোধ যুক্ত হয় তবে এরা যুগাতীত কাল ধরে তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

প্রকৃতির এক অভিনব সৃষ্টি—এই সুন্দরবনের বাঘ। এদের বুদ্ধি, চাতুর্য, মানুষের সম্পর্কে জ্ঞান, এদের কিংবদন্তিতে পর্যবসিত করেছে। মানুষখেকো

সম্পর্কে মানুষের কুসংস্কার এদের সম্পর্কে বহু অতি প্রাকৃত গুণাবলী আরোপ করতে সহায়তা করেছে।

জোয়ার ভাটার ওঠা নামা	বনরাজির বৈশিষ্ট্য	বিভাজিত বনের শতকরা পরিমাপ	প্রতি একরে বনের ঘনত্ব	বাঘের সংখ্যার পরিমাপ (বাৎসরিক মনুষ্য মৃত্যুর হার, বাঘের পায়ের ছাপ ও অন্যান্য তথ্যাদিভিত্তিক)	মন্তব্য
১) উঁচু	সমুদ্রের নিকটবর্তী বন (বালুকা বেষ্টিত) : জোয়ারের জলে এই বন ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই বনে ঝাউ ও অন্যান্য বনরাজি রয়েছে।	অতি ক্ষুদ্র অঞ্চল	বিবিধ প্রকার	ক্ষুদ্র অঞ্চলের সাপেক্ষে এখানে ব্যাঘ্রকুলের উপস্থিতি খুবই বেশি। ব্যাঘ্রকুলের প্রজননের পক্ষে এটা একটা প্রকৃষ্ট অঞ্চল। এখানে প্রচুর পরিমাণে বন্য-বরাহ ও চিতল হরিণ বর্তমান।	ব্যাঘ্রকুলের শাবকদের এ অঞ্চলে খুব বেশি দেখা যায়।
২) স্বাভাবিক জোয়ার সীমার ওপরে	(ক) সুন্দরী-হেতাল বন : এই বন সাধারণ ভাবে জোয়ারের জলে ডুবে যায় না। কেবলমাত্র বছরে দু-একবার ভরা কোটাল জোয়ারে ডুবে যায়।	২ ভাগ	৫,০০০	ব্যাঘ্রকুলের উপযুক্ত আবাসস্থল : এখানে অন্যান্য প্রাণীর উপস্থিতিও বেশি।	
	(খ) সুন্দরী-গেওয়া	২ ভাগ	৩,০০০ থেকে ৫,০০০	এরূপ বনে মনুষ্য মৃত্যুর হার বেশি, কিন্তু ব্যাঘ্রকুলের উপস্থিতি খুব বেশি নয়।	
	(গ) সুন্দরী-গেওয়া-গ-রাণ	৪ ভাগ	৩,০০০ থেকে ৫,০০০	এ অঞ্চলে ব্যাঘ্রকুলের হাতে মনুষ্য মৃত্যুর ঘটনা ঘটে, কিন্তু ব্যাঘ্রকুলের উপস্থিতি খুব বেশি নয়।	
	(ঘ) গেওয়া-হেতাল	৩ ভাগ	৩০০০ থেকে ৫০০০	ব্যাঘ্রকুলের প্রকৃষ্ট আবাসস্থল : এ বন ব্যাঘ্রকুল প্রজননের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী।	
	(ঙ) কেবলমাত্র হেতাল	৪ ভাগ	৩০০০	ব্যাঘ্রকুলের অতি উৎকৃষ্ট আবাসস্থল ; এ বন ব্যাঘ্রকুলকে আশ্রয় দান করে ও প্রজননের পক্ষেও অতি উৎকৃষ্ট আবাসস্থল।	
	(চ) কেবলমাত্র গেওয়া	২ ভাগ	২০০ থেকে ৩০০	ব্যাঘ্রকুলের উপস্থিতি খুব বেশি দেখা যায় না।	
	(ছ) কেবলমাত্র গরাণ	৫ ভাগ	৫০০ (প্রতিটি উদ্ভিদে দুটো থেকে তিনটে)	ব্যাঘ্রকুলের শিকার প্রাণী ধরার পক্ষে উৎকৃষ্ট বন। মানুষের মৃত্যুর হারও এখানে খুব বেশি।	

	(জ) গেওয়া-গরাণ	৭০ ভাগ	গেওয়া ১০০ থেকে ৪০০, গরাণ ৫০০	মনুষ্য মৃত্যুর হার এখানে বেশি ও ব্যাঘ্রকুলের এটা একটা প্রকৃষ্ট আবাসস্থল।
	(ঝ) গর্জন-কাঁকড়া	৪ ভাগ	বিবিধ উদ্ভিদের সমাহার কিন্তু ঘন সন্নিবিষ্ট নয়।	ব্যাঘ্রকুলকে সাধারণভাবে এরূপ বনে আশ্রয় গ্রহণ করতে কম দেখা যায়।
৩) স্বাভাবিক জোয়ার সীমার নিচে	ক) ধানি ঘাস	নদীনালার ধারের অঞ্চল	সাধারণ ঘন	এই বন বাঘের স্বাভাবিক আবাসস্থলের মধ্যে পড়ে না, তবে ব্যাঘ্রকুল চিতল হরিণের সন্ধানে এখানে আসে, বিশেষত কেওড়া গাছের ফল পাওয়ার সময় (এপ্রিল থেকে জুন মাস)
	খ) বাইন-ধানি ঘাস	শতকরা ২ ভাগ	ঐ	ঐ
	গ) বাইন-কেওড়া	শতকরা ২ ভাগ	ঐ	ঐ

প্রকৃতির এক অভিনব সৃষ্টি—এই সুন্দরবনের বাঘ। এদের বুদ্ধি চাতুর্য, মানুষের সম্পর্কে জ্ঞান, এদের কিংবদন্তিতে পর্যবসিত করেছে। মানুষ খেকো সম্পর্কে মানুষের কুসংস্কার এদের সম্পর্কে বহু অতি প্রাকৃত গুণাবলী আরোপ করতে সহায়তা করেছে। তাই সুন্দরবন জঙ্গলে প্রবেশের পূর্বে কোন বাউলী (কাঠুরে), মৌলী (মধু সংগ্রহকারী) বা জেলে (মাছ সংগ্রহকারী) দক্ষিণ রায়, নারায়ণী মা, বনবিবি, কালু খাঁ, শাজঙ্গলী, গাজী সাহেব প্রভৃতির পূজার্চনা করে এই বিশ্বাসে যে, এরূপ পূজা তাদের সুন্দরবনের বাঘের মতো শত্রুর ধ্বংসলীলার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় সাহায্য করবে। তা সত্বেও যখন কোন হতভাগ্য বাঘের কবলে পড়ে, সে জন্য তাদের সেই প্রবল প্রতাপান্বিত শত্রুর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, তারা এর জন্য তাদের ভাগ্যকেই দায়ী করে থাকে ও অতঃপর সেই মহাশক্তিধর বাঘের সঙ্গে আবার সানন্দে সহাবস্থানে ব্রতী হয়—পূজার্চনা প্রভৃতিকে আশ্রয় করে। তাই সুন্দরবনে বাঘ মানুষের কাছে শিব ও অশিব দুয়েরই জীবন্ত প্রতিমূর্তি—যার বিরুদ্ধে কোন নালিশ চলে না। তাই মানুষের জীবনদর্শনে সুন্দরবনের বাঘ অদ্বিতীয়। কারণ সুন্দরবনের বাঘকে যেমন সুন্দরবনের মানুষ থেকে পৃথক করা যায় না তেমনই সুন্দরবনের মানুষকেও সুন্দরবনের বাঘ থেকে পৃথক করে ভাবার কোন উপায় নেই। সহাবস্থানের এরূপ জ্বলন্ত নিদর্শন সচরাচর চোখে পড়ে না।

মানুষ ও মানুষখেকো বাঘের সম্পর্ক : জনপ্রিয় কয়েকটি কাহিনী

মানুষ ও মানুষখেকোর সম্পর্ক খুঁজতে সুন্দরবনের জলকাদার জঙ্গলে দীর্ঘ দশ বছর কাজের সুবাদেই কাটিয়েছি। অন্তর দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছি এ সম্পর্কের ধরন-ধারন, গভীরতা। স্বামীহারা বিধবা, পুত্রহারা মা ও বাবাকে দেখে সুন্দরবনের বাঘকে পৃথিবীর হিংস্রতম জীব হিসেবে চিহ্নিতও করেছি—কিন্তু সুন্দরবনের মাতলা, বিদ্যা নদীর জলে সমস্ত শোক বিসর্জন দিয়ে যখন দেখেছি ঐ সব হতভাগ্য ব্যাঘ্রহন্তার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব আবার সুন্দরবন জঙ্গলে যেতে উদ্যত তখন তাদের এ আচরণকে চরম নিষ্ঠুর কার্য বলেও মনে হয়েছে। কিন্তু এটাই সত্যি। মৃত্যু জীবনেরই মত একটা ঘটনা মাত্র জীবন দর্শনের এই গভীর সত্য বোধহয় সুন্দরবনের মানুষ উপলব্ধি করেছে নিজেদের জীবন দিয়ে।

মোটরলঞ্চ সুন্দরবনের মায়াদ্বীপ নদীর মাঝখান দিয়ে যাচ্ছিল—জলটা শান্ত কাঁচের মত স্বচ্ছ। সময়টা এপ্রিল মাসের শেযাশেযি ও সকাল। সুন্দরবনের মধুমাস—মধু সংগ্রহকারীর দল এ সময় রুজি রোজগারের তাগিদে মহাজনের নৌকো নিয়ে তাদের মাস দেড়েকের চাল, ডাল, জল নিয়ে জঙ্গলে মধু সংগ্রহ করতে বেরিয়ে পড়ে। প্রকৃতি সে সময় সুন্দরবনকে বিচিত্র রঙে সাজিয়ে দেয়—প্রায় সব গাছগুলোতেই তখন ফুল ফোটে—একসঙ্গে এত বিচিত্র ও ব্যাপক ফুলের সমারোহ অন্য কোথাও দেখা পাওয়া দুষ্কর। ফুলের সুগন্ধ ও ব্যাপকতা আকৃষ্ট করে ফুলপিপাসু মৌমাছিদের যারা সুন্দরবন অঞ্চলে দু থেকে আড়াই মাসের সংসার গড়তে চলে আসে সুদূর হিমালয় থেকে। এ মৌমাছিকে ইংরেজিতে বলে **Rock bee** ও প্রাণী তত্ত্ববিদদের ভাষায় **Apis dorsata** সুন্দরবনের আবাদ অঞ্চলের অন্যান্য গাছের ফুলের আকর্ষণও আছে

মৌমাছিদের। সব মিলে মৌমাছিদের হিমালয় থেকে আসা, মৌচাক তৈরী করা ও সর্বোপরি সুন্দরবনের মউলীদের মধু আহরণ করা অনিন্দ্যসুন্দর প্রাকৃতিক শৃঙ্খলার নজির বহন করে। সে যাই হোক যে কথা আগে বলছিলাম। মোটরলঞ্চ মায়াদ্বীপ নদী দিয়ে যেতে যেতে আরোহীরা খলসী ফুলের সুগন্ধ পাচ্ছিল ও চারিদিকে অসংখ্য মৌমাছিদের ইতঃস্তত গমনাগমন লক্ষ্য করছিল। কিন্তু দূরে কৃষ্ণকায় বস্তুটি কি? কাঠের গুড়ি? লঞ্চের সারেঙ্গের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বস্তুটিকে নিরীক্ষণে ব্যস্ত ও মন্তব্য করল না, কাঠের গুঁড়ি ত নয়। আরো কিছুটা কাছে যেতেই বোঝা গেল আপাতদৃষ্ট কৃষ্ণকায় বস্তুটি সুন্দরবন বাঘেরই মাথা—বাঘটি প্রায় মাঝনদীতে নদীর এপার থেকে ওপারে যাচ্ছিল। লঞ্চ আবার খানিকটা গতিপথ পরিবর্তন করল। বহু শিকার কাহিনী পড়েছি সেখানে সুন্দরবনের বাঘকে জলে শিকার করার সমস্যার কথা বলা হয়েছে—একটি চলমান যান থেকে আর একটি চলমান বস্তুকে শিকার করার সমস্যা ত আছেই আর তা ছাড়া বাঘ যখন জলে সাঁতার কাটে তখন কেবলমাত্র নাসারন্ধ্রর উপরিভাগটুকু দেখা যায় মাত্র। হঠাৎ এক শক্তিশালী বাতাস এসে গেল—মোটর লঞ্চ জলের ঢেউয়ের উপরে চড়ে যেতে লাগল। লঞ্চের আরোহীদের মধ্যে তখন প্রবল উত্তেজনা। সকলেই কিছু না কিছু জিনিষ হাতে তুলে নিল ও বাঘের মাথা লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করতে লাগল। কেউ লাঠি, কেউ বা কয়লার টুকরো প্রভৃতি। বেচারা বাঘকে কখনও লঞ্চটির এ পাশে কখনও বিপরীত দিকে দেখা যেতে লাগল। লঞ্চের স্টিয়ারিং এ পাশে ওপাশে ঘুরিয়ে বাঘটিকে তার স্বাভাবিক গন্তব্যস্থানে যেতে যৎপরোনাস্তি বাধা দিতে থাকল ও বাঘটির উপর দিয়ে সারেং লঞ্চটিকে নিয়ে যাওয়ায় সচেষ্ট ছিল। লাঠি বাঘটি মুখে করে দাঁত দিয়ে ভাঙ্গতে লাগল অনায়াসেই—অন্যান্য নিক্ষিপ্ত দ্রব্যাদিরও একই অবস্থা, বাঘটির এ সকল কার্যকলাপ দেখতে দেখতে আরোহীরা যুগপৎ উত্তেজিত ও বিব্রত। লঞ্চের রাঁধুনী গরম জল ছিটিয়ে দিল বাঘটির মাথা লক্ষ্য করে। কিন্তু গরম জল মায়াদ্বীপের শীতল জলের সঙ্গেই মিশে গেল বাঘের মাথা স্পর্শ না করেই। মানুষ, লঞ্চ ও বাঘের এ ঘটনা চলল প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে। হঠাৎ কি হল—বাঘটি সাময়িক আশ্রয়ের খোঁজে লঞ্চের সঙ্গে বেঁধে রাখা ডিঙ্গিতে উঠে পড়ল যেন কোন বিচক্ষণ উচ্চলম্ফনকারী তার লক্ষ্য উচ্চলম্ফনের সীমায় পৌঁছনর উদ্দেশ্য নিয়ে। ডিঙিতে উঠে কিন্তু বাঘটি একেবারে ডিঙির কাঠের পাটাতনের নীচে চলে গেল যেন ওর গভীর নিদ্রার প্রয়োজন। লঞ্চের আরোহীদের উত্তেজনা তখন চরমে পৌঁছেছে কারণ অনেকেরই ধারণা এবার

বাঘটি লাফ দিয়ে লঞ্চে চলে আসবে। লঞ্চের সারেং তখন ডিঙিতে একটি বড় দড়ি সহ নোঙর ফেলে দিয়ে লঞ্চ ও ডিঙির মধ্যে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করল। তারপরে লঞ্চটি চলতে শুরু করল নিকটবর্তী কাঠ কাটার নির্দিষ্ট বনাঞ্চলের দিকে—সেখানে অনেক নৌকা ও লোকজনের সাহায্য গ্রহণ করার জন্য। কার ভাগ্য সুপ্রসন্ন এটা অনুক্ত রেখেই আরো একটা ঘটনা ঘটে গেল। যেতে যেতে উঠল প্রবল ঝড় ও যে নদীটা অতিক্রম করতে হবে তার নামও বিদ্যা নদী যা কিনা প্রশস্ত,স্থানে স্থানে প্রায় ৫ কিলোমিটার। স্বভাবতঃই ডিঙির আরোহীর সুখনিদ্রায় কিছুটা ব্যাঘাত হল কারণ ডিঙিটি বিপজ্জনকভাবে জলের ঢেউয়ে দুলতে শুরু করল। পরে ডিঙিটিও দড়ি ছিঁড়ে জলে ডুবে গেল সঙ্গে আরোহীকে নিয়ে। কিন্তু এ তো যে সে আরোহী নয়—সকলের বিহ্বল চোখের সামনে দ্রুততম সাঁতারুর মত বিদ্যা নদী অনায়াসে সাঁতার কেটে জঙ্গলের মধ্যে চলে গেল বাঘটি। তিন ঘণ্টা মানুষ, লঞ্চ ও প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে বিজয়ী বিচিত্র এ ক্ষমতাধর সুন্দরবনের বাঘ তার বাসস্থলে চলে গেল যেন কোন কিছুই ঘটেনি বিগত তিন ঘণ্টায়।

সুন্দরবনের বাঘ আচমকা আসে ও কোনকিছু বোঝার আগেই শিকার করে চলে যেতে পারে। সময়টা তখন বিকেল চারটে, সাড়ে চারটে, স্থান ছোটহর্দীর জঙ্গল। নেকড়িখালি ও ছোটহর্দী নদীর সংযোগস্থলে কৃপা মণ্ডল সঙ্গী সাথী নিয়ে কাঁকড়া ধরতে ব্যস্ত। গতবার কৃপার ভাগ্যে কাঁকড়া বিশেষ জোটেনি তাই এবার কৃপা ঠিক করেছে গতবারের লোকসান কিছুটা মিটিয়ে নেবে। এ স্থানটিতে কাঁকড়া বেশী পাওয়া যায় কিন্তু ভয় হচ্ছে ব্যাঘ্র প্রকল্পের কর্মীদের,কারণ এ নদীটিতে কাঁকড়া, মাছ ধরা নিষেধ কারণ এ স্থানটি প্রকল্পের কোর এরিয়ার মধ্যে পড়ে। কৃপা তাই কাঁকড়া ধরছে আর কান খাড়া করে শুনছে টহলদারী লঞ্চের আওয়াজ আসছে কিনা। তখন জোয়ার সবে শুরু হয়েছে। আরো ঘণ্টাখানেক কাঁকড়া ধরা যাবে রাতের মত নৌকো অ্যাঙ্কর করার আগে। কিন্তু কৃপা জানতই না যে তাহারা একটি কুখ্যাত মানুষখেকো বাঘের নজরের মধ্যে ছিল। কাজে এতই ব্যস্ত ছিল যে কৃপা ও তার সঙ্গী সাথীরা বুঝতেই পারেনি যে তাদের নৌকোটা যে খালে ছিল সেটা এতটা সরু হয়ে যাবে। তাদের ত আরও ৪৫ মিনিট লাগবে রাত্রিবাসের জায়গায় পৌঁছতে। একটি কুখ্যাত মানুষখেকো জঙ্গলের আড়াল থেকে তাদের পিছু নিয়েছে ও নৌকোর সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে অনুসরণ করছে। তাদের নৌকোর সঙ্গী তারাপদ হঠাৎ খালের পারের দিকে তাকিয়ে আবিষ্কার করল ঐ মানুষখেকোকে।মানুষখেকোকে তখন

নৌকোর অন্যান্য সঙ্গীসাথীরাও দেখে ফেলেছে। সকলে মিলে প্রচণ্ড হৈ চৈ করল বাঘটিকে তাড়াতে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বাঘটি জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে নৌকোর সামনা সামনি আসতে উদ্যত হয়েছিল। কিন্তু নৌকোর সঙ্গীসাথীর চিৎকার বনবিভাগের একটি নৌকোকে ঐ স্থানে আসতে বাধ্য করেছিল। আরও একটি নৌকো দেখে বাঘটি বনাঞ্চলের অভ্যন্তরে চলে গেল বোধহয় অসীম বিরক্তি নিয়ে।

নাসিরুদ্দিন মিয়ার কাছ থেকে সুন্দরবন বাঘের গল্প শুনছিলাম সব। তার প্রায় ৫০ বছরের অভিজ্ঞতা এ জঙ্গলে, বয়স প্রায় ৭৫ থেকে ৮০। গল্প বলতে বলতে মিয়া সেদিন ঠোঁটের পাশ দিয়ে হাসছিল হুক্কা হাতে করে। সেবার কাঠুয়া ঝুড়ীর জঙ্গলে বাঘের কি দারুণ উপদ্রব ছিল সেটা বর্ণনা করতে যাচ্ছিল। ঘটনার বছরটা মনে করতে পারছিল না মিয়া। বারে বারে হুক্কা মুখ থেকে নামাচ্ছিল আর পরক্ষণেই মুখে দিচ্ছিল কিন্তু কিছুতেই সালটা বলতে পারছিল না। চোখ দুটো চক চক করছিল নাসিরুদ্দিন মিয়ার গল্পটা বলার সময়।

বনবিভাগের কর্মীরা বন্দুক, রাইফেল নিয়ে কাঠুরিয়াঝুড়ীতে পাহারার কাজে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু সেবার একটি মানুষখেকো বাঘ নয়জন মানুষ এ জঙ্গল থেকে নিয়েছে। আর উক্ত নজনের মধ্যে মাত্র ৩টিরই মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মিয়া বলতে লাগল যখন শেষ মানুষটির মৃতদেহ অন্যান্য সঙ্গীসাথীরা বহন করে নিয়ে যাচ্ছে তখন হঠাৎ 'বাঘ বাঘ' ধ্বনি শোনা যায়। একটি বিরাট বাঘকে মৃতদেহ বহনকারী দলটির সামান্য আগে হঠাৎ দেখা গেল। সময়টা বিকেল প্রায় ৫ ঘটিকা। বাঘ সামনে দেখতে পেয়ে দলের সমস্ত লোকই মৃত দেহ ফেলে দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে পালিয়ে গেল ও জলে ঝাঁপ দিল। তখন যে দৃশ্য দেখা গেল সেটি সত্যিই চমকপ্রদ—জলে সাঁতারুদের প্রাণভয়ে তাদের নোঙর করা নৌকোর দিকে সাঁতার কাটা ও নদীর পারে বাঘরূপী সাক্ষাৎ মৃত্যুর অনুসরণ। সাঁতারুদের করুণ অবস্থা সহজেই অনুমেয়। কারণ জলে সাঁতার কাটা মোটেই নিরাপদ নয়। কুমীর হাঙর ও সুন্দরবনের নদীতে বিভিন্ন প্রকার বিপরীত মুখী জলের স্রোতে মৃত্যুর হাতছানি। কিন্তু হঠাৎ 'সুন্দরবন ডেসপ্যাচ সার্ভিস' নামে একটি জলযান সাঁতারুদের করুণ অবস্থা দেখে ঐ স্থানে হাজির হল। উক্ত জলযান পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) অভিমুখে যাচ্ছিল যাত্রী নিয়ে। তৎক্ষণাৎ উক্ত জলযানের কর্মীরা তখন স্পীডবোট নিয়ে অবিলম্বে মরণোন্মুখ সাঁতারুদের রক্ষা করে। দূর থেকে বাঘ সমস্ত ঘটনা দেখে উক্ত স্থান ত্যাগ করে জঙ্গলের গভীরে চলে যায়। এর পরেও নাকি দুজন হতভাগ্যকে বাঘ নিয়ে যায় উক্ত কাঠুয়াঝুড়ী

জঙ্গল থেকে। বলতে বলতে নাসিরুদ্দীনের গলা ধরে যাচ্ছিল। কিন্তু এ সকল সত্য ঘটনা গল্পের মত শোনার আগ্রহ কিছুতেই কমান যায় না—তাই নাসিরুদ্দিনকে বার বার অনুরোধ করায় সেও অনর্গল বলে যেতে লাগল। তার নিজের চোখে দেখা জীবন ও মৃত্যুর অবিস্মরণীয় ঘটনাগুলো।

আকসার গাজীর বয়স তখন প্রায় ৬৫ বছর। সে গত ৩৫ বছর ধরে গোল পাতার ব্যবসা করে আসছে। সে সুন্দরবন জঙ্গলকে খুব ভাল চেনে তাই সাবধানতা অবলম্বন তার মজ্জাগত, কারণ আকসার গাজীর মতে সুন্দরবনে নাকি প্রতিটি মানুষের পিছনে প্রতি মুহূর্তের মৃত্যু ধাওয়া করে,যারা যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করে তারাই বাঁচতে পারে। কোন এক আগস্ট মাসের বিকেলে আকসার গোলপাতার কাজের জন্য চামটা জঙ্গলে ঢুকেছে আর সাবধানতার জন্য দুজন লোককে রেখেছে পাহারার উদ্দেশ্যে তারই কাছাকাছি। হঠাৎ আকসার লক্ষ্য করল একজন পাহারাদার নেই—যেখানে পাহারাদাররা অপেক্ষমান ছিল সেখানে ছুটে গিয়ে দেখল যে সেখানে মাটিতে পুরুষ বাঘের পায়ের ছাপ রয়েছে। আকসার তখন অন্য একজন পাহারাদার আশ্রফকে নিয়ে বাঘের পায়ের দাগ অনুসরণ করতে লাগল। হঠাৎ মৃত পাহারাদারের মৃতদেহ তার নজরে এল।পরমুহূর্তেই আকসার দেখল কোত্থেকে এক মানুষখেকো বাঘ এসে তার সঙ্গী আশ্রফকে ডানদিকের ঘাড় মটকে মুখে করে নিয়ে চলে যাচ্ছে। ঘটনার আকস্মিকতায় আকসার গাজী যার পর নাই বিস্ময়াবিষ্ট। আকসার তখন একমাত্র পুরস্কার পেল দুটো মৃতদেহই সে তার নিজের কাঁধে চাপিয়ে অপেক্ষমান নৌকোয় নিয়ে আসার। কিন্তু দারিদ্র্য মানুষের এতই বড় বোঝা যে আকসারকে আবার ৭ দিনের মধ্যেই গোল পাতার কাজে জঙ্গলে ঢুকতে হল। এবার কিন্তু আকসার গোসাবার জঙ্গলে গেল চারজন সঙ্গী সাথী নিয়ে। কিন্তু বনের মধ্যে ঢোকার মুখেই মাটিতে একটি পুরুষ বাঘের পায়ের ছাপ দেখে আঁৎকে উঠল। তার পরের মুহূর্তেই বাঘের বিকট গর্জন শুনল। আকসারের সঙ্গী সাথীরা বাঘের গর্জন শুনে তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হয়ে গেল ও বনের মধ্যে ঢোকার বাসনা ত্যাগ করে নৌকোতে ফিরে এল। ভাগ্যদেবী সেবার সুপ্রসন্ন থাকায় তারা সেবার সাক্ষাৎ বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পেল।

বাঘের আক্রমণ যে কত আকস্মিক ও দ্রুত হয় তার কাহিনী শুনিয়ে চলেছেন নাসিরুদ্দীন। কোন এক শীতের সকালে নিবারণ সমাদ্দার তার অন্য চার সঙ্গী সাথী নিয়ে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহের জন্য নৌকো নিয়ে সুন্দরবন জঙ্গলের পঞ্চমুখানীতে এসেছে। নিবারণ সামনে কিছু শুকনো কাঠের ডাল নিয়ে সেগুলো

সংগ্রহ করে নৌকোতে ফিরছে এমন সময় সে বাঘের সতেজ পায়ের ছাপ দেখতে পেল মাটিতে। গাছে বানরের ইতঃস্তত গমনাগমন বাঘের নিকট উপস্থিতি প্রমাণ করল। নিবারণ এতই ভয় পেয়ে গেল যে বাঁচাও বাঁচাও বলে গলা ছেড়ে অন্য সঙ্গী সাথীকে ডাকতে লাগল তার স্বরে। কিন্তু কোন সাহায্য পৌঁছনোর আগেই একটি বাঘ এসে তাকে ধরল। কিন্তু অন্য সঙ্গী সাথীরা তৎক্ষণাৎ আসায় বাঘ মৃতদেহ ফেলেই চলে গেল। মৃতদেহের শিরদাঁড়া ও ডান কাঁধ ভাঙা। এ হচ্ছে সুন্দরবনের বাঘ—নাসিরুদ্দীনের গলায় অসীম কৌতূহল ও বিস্ময়।

সতীশ মণ্ডল পঞ্চাশে পা দিয়েছে। বিগত ৩০ বছর ধরে সুন্দরবনে কাঠের কাজের সঙ্গে যুক্ত আছে। বহু বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন হারিয়েছে সুন্দরবন জঙ্গলে। কিন্তু প্রয়োজন তো যুক্তি ও আইন মানে না—তাই সতীশ জঙ্গলে আসা ত্যাগ করতে পারে না, সতীশ বর্যাকালের কোন এক রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে সঙ্গী সাথীর সঙ্গে নৌকোতে ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ সে নৌকোতে খানিকটা আন্দোলনের আভাস পেল ও তখনই টর্চ হাতে নিয়ে বাইরে এসে টর্চ মেরে দেখল একটি বাঘ নৌকোতে ওঠার প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে। নৌকোর গলুই খানিকটা উঁচু হওয়ায় ও সঙ্গে ছোট ডিঙি না থাকায় বাঘ কিছুতেই উপরে উঠতে পারছে না। সতীশ তখন অন্য সঙ্গী সাথীকে ডেকে গরাণের লাঠি দিয়ে বাঘের মাথায় সজোরে আঘাত করে ও বাঘ তখন সাঁতার কেটে জঙ্গলে ফিরে আসে।

চোরা চালানকারীদের মত বাঘও নাকি সরকারী নৌকো চেনে অন্ততঃ নাসিরুদ্দীন তাই মনে করে।

কোন এক বর্যার রাত্রে সজনেখালী পেট্রোলের ফরেস্টার পিরখালীতে নৌকো নোঙর করেছে রাত ১১টা নাগাদ। খাওয়া-দাওয়া শেয। ফরেস্টার তার কেবিনে শুয়েছে হঠাৎ তার নৌকা নড়ার মত মনে হল। তৎক্ষণাৎ সঙ্গী ফরেস্ট গার্ড টর্চ নিয়ে পিছনের দিকে যেতেই দেখতে পেল এক বিরাটকায় বাঘ নৌকোর উপরে। ফরেস্ট গার্ড বাঘের দিকে চোখ রেখে পেছন দিয়ে চলতে চলতে কেবিনে লাফিয়ে পড়ল ও অন্যদের জাগিয়ে তুলল। বাঘটি হতাশ হয়ে জলে ঝাঁপ দিল ও সাঁতার কেটে জঙ্গলে চলে গেল। ফরেস্ট গার্ডের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য সেবার এক বিরাট বিপদ থেকে রক্ষা পেল সকলেই।

সন্ন্যাসী মণ্ডল মাছের ব্যবসায় আছে প্রায় ২০ বছর—বয়স প্রায় ৪৫। সন্ন্যাসী একবার বাঘের মুখোমুখী হয়েছিল তারই নৌকোয়। সেটা ছিল মে মাসের রাত। বনের নাম বাঘমারা। রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে আছে

সুন্দরবনে টহলদারীর উদ্দেশ্যে রওনা

সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকে বাঘ ধরা পড়েছে

সন্ন্যাসী অন্য চার জনের সঙ্গে। হঠাৎ কি হল সে চোখ খুলে এক জোড়া চোখ কেরোসিনের অস্পষ্ট আলোতে দেখতে পেয়ে ভয়ে শিউরে উঠল। সন্ন্যাসী ঠিক তখন কি করেছে সেটা বলতে পারল না তবে এটা তার মনে আছে যে সে তারস্বরে চীৎকার করতে চেয়েছিল কিন্তু তার গলা থেকে একটা শব্দও বেরোচ্ছিল না। কিন্তু কি হলো বাঘ ঘুমন্ত অনন্ত সর্দার নামে একজনকে তুলে নৌকো থেকে ঝাঁপ দিল মুহূর্তের মধ্যে ও অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেল।

সন্ন্যাসী অনন্তর সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীকে অভয় দিয়ে এসেছিল যে ওরা দুজনে যাচ্ছে ও দুজনেই ফিরবে তাই অনন্তর স্ত্রীর চিন্তার কারণ নেই। এখন সন্ন্যাসী ভাবছে যে গ্রামে ফিরে অনন্তর স্ত্রীকে সে কি বলবে। কি ই বা সান্ত্বনা দেবে—সন্ন্যাসী সুন্দরবনের মাছের ব্যবসায়ের বিপদের দিকগুলো বলছিল—একদিকে মহাজনের রক্ত চক্ষু, অন্যদিকে বাঘ, কুমীর ও হাঙরের বিপদ। তার উপরে রয়েছে ডাকাত ও চোরা চালানকারীর আক্রমণ। কিন্তু এত বিপদ সত্ত্বেও সন্ন্যাসী কিন্তু একবারও তার মাছের ব্যবসা ত্যাগ করার কথা ভাবে না কারণ তার সামনে এর অন্য কোন বিকল্প নেই। সন্ন্যাসীর মতে সুন্দরবনের বাঘ অতি প্রাকৃত ক্ষমতার অধিকারী তা ছাড়া সে কি করে নিঃশব্দে নৌকোতে উঠে মানুষ শিকার করতে পারে।

রসিক মণ্ডলের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। রসিক গর্বের সঙ্গে তার মানুকখেকো বাঘের থেকে বেঁচে যাওয়ার কথা বলছিল। অভিজ্ঞ রসিকের মতে সুন্দরবনের বাঘ সুন্দরবনের সর্বত্রই রয়েছে ও তারা নাকি মানুষেরই সন্ধানে এক দ্বীপ থেকে আর এক দ্বীপে আসে। তার মতে সুন্দরবনে চামটা দ্বীপের বাঘই হচ্ছে সবথেকে বিপজ্জনক ও ধূর্ত। রসিকের নৌকোতে একবার বাঘ উঠেছিল কিন্তু সেও তার সঙ্গীসাথীরা সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল বলেই সে যাত্রা রক্ষা পেয়েছিল।

বিষ্ণু রফতান একজন বৃদ্ধ মউলী দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে সুন্দরবনে সে যাতায়াত করছে। বহুবার বাঘ দেখেছে এ বনে—বাঘের বহু প্রত্যক্ষ রোমাঞ্চকর ঘটনার সাক্ষী সে। তার নিজের চোখও রক্তবর্ণ। কথায় কথায় তার চোখ রক্তবর্ণ হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করতেই সে ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ দিতে শুরু করল। একবার মধু আনতে গিয়ে বিষ্ণু ও তার গুরু হঠাৎ বিপদের আশঙ্কা প্রকাশ করে বলল, যে তাদের এ মুহূর্তে সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। তার সে সাবধানবাণী কিন্তু অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল কারণ তারা তৎক্ষণাৎ একটি বিরাট বাঘ দেখতে পেল। সেদিন শুক্রবার ছিল বিষ্ণুর ভালই মনে আছে। বাঘ দেখে

তারা আর কোন কাজ না করে তাদের নৌকোতে ফিরে এসে সারাদিন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করল। পরের দিন ভোর হতেই তারা মন্ত্রপাঠ করে বনদেবীর পূজো দিল ও জঙ্গলে মধুসংগ্রহের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। বিষ্ণু রফতান দল থেকে খানিকটা পিছনে পড়ে গেল—সুন্দরবনের গাছের শুলো এতই সরু ও সংখ্যায় এতই বেশী যে চলার সময় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন না করলে পায়ে শুলো বিধে দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। রফতানের বয়স বাড়ছে তাই সাবধানতাও সময়ের তালে তালে বাড়ছে। হঠাৎ একটি বিরাট বাঘ এসে বিষ্ণুর সামনে হাজির হল। জঙ্গলটা এতই গরাণ ও বাইনের ছোট ছোট গাছে ভর্তি যে একহাত দূরে কি আছে দেখাই যায় না। বিষ্ণু শুনেছে সুন্দরবন জঙ্গল নাকি পৃথিবীর গহনতম বনের মধ্যে একটি। হঠাৎ কোথা থেকে একটি বাঘ বিষ্ণুর সামনে এল বিষ্ণুর কিছু বোঝার আগেই। কিন্তু বিষ্ণু তো কোন কিছুতেই দমে যাওয়ার লোক নয়—সে সাহসে ভর করে বাঘটির উদ্দেশ্যে বলল, "শয়তান—তুই কোত্থেকে এসে গেলি ?" বিষ্ণুর সঙ্গে ধারালো কাটারী (দাও) ছিল। কিন্তু বাঘটি সম্ভবতঃ ক্ষুধার্ত ছিল—মাঝে মাঝে ঘড় ঘড় শব্দ করছিল, লেজ নাড়াচ্ছিল ও মুখটা হা করছিল মাঝে মাঝেই—লালা ঝরছিল জিবের ডগা থেকে ও পিছনের পা ছড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছিল যার জন্য বাঘটিকে তার নিজের দৈর্ঘ্যের প্রায় দ্বিগুণ মনে হচ্ছিল। যদিও মৃত্যু অবধারিত তথাপি কিন্তু বিষ্ণু ভয়ের কাছে নতি স্বীকার করেনি—কাটারীটিকে প্রস্তুত রেখেছিল প্রয়োজনীয় ব্যবহারের জন্য। বিষ্ণুর চোখের দৃষ্টি বাঘের চোখের উপরে নিবদ্ধ ছিল ও সে অবস্থাতেই বিষ্ণু আস্তে আস্তে পিছনে হটতে লাগল ও দু হাত দিয়ে মাটি স্পর্শ করে একটি মন্ত্র উচ্চারণ করল। বাঘটির কি মনে হল বিষ্ণুর জানা নেই কিন্তু হঠাৎ লাফ দিয়ে পিছনে চলে গিয়ে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। বিষ্ণু সে যাত্রা প্রাণে বেঁচে গেল বটে কিন্তু তার শরীরের তাপাঙ্ক উচ্চতম সীমায় পৌঁছে গেল ও গা হাত পা পুড়ে যাওয়ার মত মনে হল। তার চোখ দুটো হয়ে গেল রক্তের মত লাল্ ও সে রক্তবর্ণ চোখ আজও রয়ে গেছে তার দীর্ঘ বারো বছর পরেও। সুন্দরবন বাঘের সঙ্গে কয়েক সেকেন্ডের সাক্ষাৎ বিষ্ণুর শরীরে ও মনে সম্পূর্ণ বিবর্তন এনেছে।

গোসাবা গ্রামের গোলাম মহম্মদ বিগত তিরিশ বছর ধরে মধু ও মোম সংগ্রহ করে আসছে। গোলাম মহম্মদের কাছ থেকে শুনছিলাম কি নিদারুণ দুঃখজনক পরিস্থিতির মধ্যে সে তার সাত-সাতজন সঙ্গীকে সুন্দরবনে হারিয়েছে। কিন্তু বর্তমান ঘটনাটা একটু ভিন্ন ধরণের। গোলাম গভীরভাবে মন্ত্র শক্তিতে বিশ্বাসী।

সে কিভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করে সুন্দরবন বাঘরূপী সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচেছে সেটা বলতে লাগল গোলাম মহম্মদ। সেদিন ছিল পরিষ্কার রৌদ্র ঝলমল সকাল। সামান্য মৃদু মন্দ হাওয়া ঘুরে ঘুরে এসে সুন্দরবনের নদী ও খালগুলো মাঝে মাঝে নৃত্যে আন্দোলিত করতে লাগল। গোলাম নৌকার গলুইতে বসে সেদিন প্রকৃতির শোভা দেখছিল ও বিশেষ করে গোলপাতার সোনালী পিঙ্গল রঙ ও ধানি ঘাসের পান্না—সবুজ রেখা গোলামের মনে এক অজানা পুলক জাগিয়ে তুলেছে। তখন ভাটা পড়তে শুরু করেছে ও নৌকোটি পাড়ের একেবারে কাছে রয়েছে। গোলামের ছেলে রহিম নৌকোর মধ্যে রান্নার কাজে ব্যস্ত ছিল—হঠাৎ কি হল—রহিমের চীৎকার শোনা গেল— "বাঘ, বাঘ" আর তার সাথে সাথেই চার শো পাউণ্ড ওজনের প্রাণীটি গোলামের উপরে। বাঘটি নৌকোতে লাফিয়ে পড়ার প্রভাবে নৌকো নড়ে উঠল ও বাঘ তার মুখে গোলামের ঘাড় ধরতে না পেরে কেবলমাত্র সামনের থাবা দিয়ে গোলামের জানু স্পর্শ করল। গোলাম তখন ভয়ে প্রায় সংজ্ঞাহীন,ও কি করে সে সময়টা কাটাল সে বুঝতেই পারছে না। গোলামের যেটুকু মনে আছে সেটা হল যে বাঘটির মাথা সজোরে ধরে ফেলল ও বাঘের প্রতি চীৎকার করে বলতে লাগল, "তুই অপদার্থ শয়তান, পালিয়ে যা ; তুই কি জানিস না কোত্থেকে তুই এসেছিস ?" সে সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সঙ্গী সাথীরা এসে গেল। ক্রমাগত চীৎকার ও লাঠি দিয়ে আঘাত করতে লাগল সকলে বাঘটির উপরে। এর ফলে বাঘ গোলামকে ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলে যেতে বাধ্য হল। গোলাম বিড়বিড় করে মন্ত্রও নাকি উচ্চারণ করেছিল বাঘ নৌকোতে আসার পর থেকেই। গোলাম তার ক্ষতস্থানটি সকলকে দেখাল—কিন্তু সে যে প্রাণে বেঁচেছে সেজন্য সকলেই বনদেবীকে শতকোটি প্রণাম জানাল।

আমতলি গ্রামে গজন হাউলির কাছ থেকে বাঘের কথা শুনছিলাম। গজন গত প্রায় ৩৮ বছর ধরে মধু সংগ্রহের কাজ করছে। সে বহু মানুষকে বাঘের আক্রমণে মরতে শুনেছে ও দেখেছে। অন্যান্য সকলের মতই সে এ সকল ঘটনা অবশ্যম্ভাবী বলে মেনে নিয়েছে। মৌমাছির আকাশে বিচরণের ক্ষেত্র বুঝে নিয়ে গজন কোনদিন দুপুরে একটি ছোট খাল বেছে নিয়েছে মধু আহরণের জন্য। গজনকে নিয়ে চার জন জঙ্গলে নেমেছে সারিবদ্ধ ভাবে একজন থেকে আর একজনের দূরত্ব ২০ মিটারের মত। গজন কথা বলছে, অন্যান্য সঙ্গীকে উপদেশ দিচ্ছে ও আগে আগে নিজে এগোচ্ছে। হঠাৎ গজন অনুভব করল সে নিজেই কথা বলছে কিন্তু অন্য সঙ্গী সাথীরা কোনও শব্দ করছে না। পিছনে তাকিয়ে

কোনও সঙ্গী সাথীদের দেখতে না পেয়ে সেও পিছনে যেতে শুরু করল ও দেখতে পেল যে একটি বাঘ তার সঙ্গী প্রতাপকে গলায় ধরেছে ও অন্যান্য দুজনকে দেখে অজ্ঞান হয়ে খানিক দূরে মাটিতে পরে রয়েছে। গজনের বন্ধুপ্রীতি তার ভীতি ও আশঙ্কাকে পর্যুদস্ত করল—গজন তার হাতের গরান লাঠি নিয়ে বাঘটিকে চীৎকার করে তাড়া করতে লাগল। বাঘটি প্রতাপের মৃতদেহ নিয়ে পালানোর চেষ্টা করল। পিছনে গজন লাঠি নিয়ে তাড়াচ্ছে। একসময় মৃত প্রতাপের এক পা গরাণ জঙ্গলের মধ্যে এমন ভাবে আটকে গেল যে বাঘ কিছুতেই ছাড়িয়ে নিতে পারছিল না। সে সময় বাঘ ও গজনের মধ্যে প্রতাপের মৃত দেহ নিয়ে টাগ-অফ-ওয়্যার শুরু হয়ে গেল। বাঘটি ঘাড় ধরে সামনে টানছে ও গজন পিছনের এক পা ধরে প্রতাপের মৃতদেহ টানছে। ততক্ষণে আর দু সঙ্গীর সম্বিৎ ফিরে এসেছে ও তারা তখন গজনের সঙ্গে এসে যোগ দিয়ে বাঘটিকে গরানের লাঠি দিয়ে প্রাণপণ মারতে শুরু করল, বাঘ তখন মৃতদেহ ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলের ভিতরে চলে গেল।

অনন্ত মণ্ডল বিগত পঁচিশ বছর ধরে মধু ও মোম সংগ্রহ করে আসছে। বয়স প্রায় পঞ্চাশের কোঠায়। বাড়ী ছোটমোল্লাখালি, থানা গোসাবা। বাঘের কথা জিজ্ঞেস করায় অনন্তর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ও অনেকগুলো কথা একসঙ্গে ওর মনে এল। সেটা বোধ হয় মে মাসের মাঝামাঝি হবে। অনন্ত ও অন্য চারজন সঙ্গী সবে মধু আহরণের কাজ শেষ করে নৌকোতে ফিরে এসেছে। হঠাৎ কিছু মৌমাছির নিকটবর্তী জঙ্গলে গমনাগমন অনন্তর দৃষ্টি আকৃষ্ট করল। অনন্তর নিশ্চিত বিশ্বাস হল যে ঐ স্থানে কিছু মৌচাক পাওয়া যাবে। তৎক্ষণাৎ অনন্ত তার দুজন সঙ্গীকে নিয়ে ঐ সকল মৌচাকের সন্ধানে বনে ঢুকে পড়ল। কিন্তু সে বন ঝামটি গরানের জঙ্গলে এতই ঘন যে এক হাত দূরে কি আছে দেখাই যাচ্ছে না তাই মৌচাকের সঠিক অবস্থান নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে অনন্ত নিকটবর্তী একটা কেওড়া গাছে উঠে বসল ও মৌচাকের সন্ধানে এদিক ওদিক দেখতে লাগল। অন্যান্য তিন সঙ্গী নিচে মৌচাক সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু অনন্ত হঠাৎ গাছের উপর থেকে দেখল একটি বাঘ তার এক সঙ্গীর দিকে আস্তে আস্তে অগ্রসর হচ্ছে। ভীতি অনন্তকে এতই পঙ্গু করেছে যে অনন্তর মুখ থেকে কোন শব্দই বেরোচ্ছে না ও অনন্ত একটুও নড়তে পারছে না। অনন্ত বাঘটিকে লেজ নাড়তে ও তার সঙ্গীর উপরে লাফ দিতে উদ্যত হতে দেখল। হতভাগ্য মানুষটি বোধ হয় জানতেও পারছে না যে বাঘ তার মৃত্যুর সমন জারি করে দিয়েছে। বাঘটি যেই লাফ দিল। সঙ্গী বন্ধুটি বোধ হয় আগে থেকেই বিপদের

সঙ্কেত পেয়ে দু' দুবার ঘুরল। যাতে বাঘ নিকটবর্তী ঘন জঙ্গলের জন্য দু এক ইঞ্চির জন্য শিকারকে ধরতে ব্যর্থ হল। পরবর্তী দৃশ্য সুন্দরবনের জন্য সত্যিই অপূর্ব ও বিস্ময়কর। বাঘে মানুষে টানাটানি। বাঘটি তার থাবা দিয়ে শিকার ধরতে ব্যস্ত কিন্তু তিনজন শক্ত সমর্থ মানুষ তাদের হাতে যা যা আছে সেটা দিয়ে মাটিতে প্রাণপণে আঘাত করতে ও চীৎকার করতে ব্যস্ত। এ কাজে বোধ হয় বাঘের পক্ষে বিপদের সঙ্কেত ঘোষিত হয়েছিল ও বাঘটি তৎক্ষণাৎ মুহূর্তের মধ্যে শিকার ছেড়ে গভীর বনের মধ্যে চলে গেল। অনন্তর মতে সে যাত্রা তারা বেঁচে গেল কারণ বাঘটি নাকি ছিল অল্পবয়সের ও অনভিজ্ঞ। কারণ সুন্দরবনের পূর্ণবয়স্ক বাঘ নাকি কোন ক্ষেত্রেই তার শিকার করার জন্য শেষ চেষ্টাতে ব্যর্থ হয় না—যদি মনে হয় শিকারে ব্যর্থ হবে তবে কখনই সে শেষ লাফ দেবে না। অনন্ত তাদের দুঃখজনক জীবনের কথাও বলল। সুন্দরবনের জঙ্গল সাক্ষাৎ মৃত্যু জেনেই তারা বছরের পর বছর এসে থাকে জীবন ও জীবিকার তাগিদে, কারণ এর কোন সহজতর বিকল্প তাদের জানা নেই—দারিদ্র্য অভিশাপ কিন্তু দু মুঠো অন্নও যে নিরন্ন অবস্থার চেয়ে শ্রেয় সেটা তারা উপলব্ধি করেছে জীবন দিয়ে।

কাটাখালীর নগর আলির মতে "সুন্দরবনের বাঘ ভীতুপ্রকৃতির। তারা চোরের মত আসে পেছন থেকে আক্রমণ করে ও চোরের মতই পালিয়ে যায়"। নগর আলি বিগত বিশ বছর ধরে সুন্দরবন জঙ্গল থেকে মধু সংগ্রহ করে আসছে। কথা বলতে বলতে নগর আলি স্মরণ করল একদিনের কথা। চোখটা তার ছলছল করে উঠল। কোনও এক রাতে সে ও তার সঙ্গী সাথীরা মধু আহরণ শেষ করে নৌকোতে ফিরে এসে গল্পগুজব করছে রাতের খাবার তৈরি হচ্ছিল। কেউ আপন মনে গান ধরেছিল আর কেউ গল্পগুজবে ব্যস্ত। মালেক মোল্লা এক কোণায় বসে নিজের মনে কি ভাবছিল—সে কোনও গল্পগুজবে মন দিচ্ছিল না বিশেষ। হঠাৎ কি হল ? জলে একটা ছলাৎ করে শব্দ হল—কোনও ভারী জিনিষ জলে পড়লে যে রকম শব্দ হয়। কিন্তু মালেক মোল্লা কোথায় ? নৌকাতে কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। তখন এদিক ওদিক টর্চ দিয়ে দেখা শুরু হল। দূরের পাড়ে বাঘের মুখে মালেক মোল্লার চেহারাটা দেখা গেল। পরদিন ভোরবেলা মালেক মোল্লার অর্ধভুক্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হল। নগর আলির মতে সুন্দরবনের মানুষখেকো বাঘেরা প্রথমে শরীরের নরম পাকস্থলীর অংশটা খেয়ে নেয়। অন্য আরও একজন সঙ্গীর এ ঘটনায় বছর খানেক আগে এ জায়গায় এভাবেই মৃত্যু ঘটে। নগর আলীর মনে পড়ল।

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। তখন চামটা ব্লকে টিম্বার ক্যূপ হচ্ছে। শত

শত নৌকা, কোনটা বড়, কোনটা ছোট, কোনটা বা মাঝারি রয়েছে চামটা খালের মধ্যে। সেদিনটা ছিল শীতকালের উজ্জ্বল সকাল। টিম্বার ক্যাপের ক্যাপ অফিসার চল্লিশ বছর বয়স্ক সুনীল মণ্ডলকে তার সঙ্গে ডিঙ্গিতে যেতে অনুরোধ করল। কিন্তু সুনীল অসুস্থতার অজুহাতে যেতে অস্বীকার করল। সুনীলের সেদিন মাছ ধরবার পরিকল্পনা ছিল। সে ক্যাপ অফিসারের ক্যাপের নৌকা ছেড়ে জঙ্গলে চলে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিল—কারণ ক্যাপ অফিসার ক্যাপের মধ্যে মাছ ধরতে অনুমতি দেন না। তাই ক্যাপ অফিসার চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুনীল মাছ ধরার জাল নিয়ে মাছ ধরতে শুরু করল নোঙর করা নৌকাগুলির কাছেই। সুনীলের সঙ্গে অতুলও ছিল মাছ ধরার কাজে। হঠাৎ ধপ করে পড়ার শব্দ অতুলের কানে গেল, ও তাকিয়ে দেখতে পেল যে তার সঙ্গীকে একটি বাঘ বিদ্যুৎ গতিতে মুখে করে নিয়ে যাচ্ছে। অতুলের কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে শুধু তাকিয়ে দেখা ছাড়া আর কিছু করার ক্ষমতা ছিল না। ক্যাপের কাজ বন্ধ হয়ে গেল। অন্যান্য ক্যাপের কর্মীরা মিলে সুনীলের মৃতদেহ উদ্ধার করল।

হিঙ্গলগঞ্জের বসন্ত রফতানের বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। সে গোলপাতা ক্যাপে কাজ করে আসছে গত তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে। বহুবার বাঘ দেখেছে। বাঘের আক্রমণে মানুষকে মরতে দেখেছে। সে দু দুবার বাঘের আক্রমণ থেকে ভাগ্যক্রমে উদ্ধার পেয়েছে। একবার বসন্ত অন্যান্য তিন সঙ্গীকে নিয়ে চামটা ব্লকে গোলপাতা সংগ্রহ করতে যাচ্ছিল। সময়টা ছিল শীতের সকাল। হঠাৎ কোথা থেকে একটা বাঘ এসে মুখের নানা অঙ্গভঙ্গি করতে লাগল বসন্তর সামনে—বসন্ত তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তার হাতে শক্ত সুন্দরীর লাঠিটা বাঘের মুখের মধ্যে পুরে দিল সজোরে। অন্যান্য সঙ্গী সাথীরাও তাদের হাতের লাঠি দিয়ে বাঘের গায়ে সজোরে পেটাতে লাগল ও চীৎকার করতে লাগল। হঠাৎ বাঘটা কি মনে করে তাদের ছেড়ে দিয়ে বনাভ্যন্তরে চলে গেল। কিন্তু বসন্ত রফতানের সে ঘটনায় এত প্রচণ্ড জ্বর হল যে সে জ্বর কমতে তার প্রায় দু'মাস লেগেছিল গ্রামের ডাক্তার, বদ্যির চিকিৎসা সত্ত্বেও । অন্য আর একটি ঘটনার কথা বলতে গিয়ে রফতান বলতে লাগল যে, কোনও একদিন সে ও অন্য ছজন সঙ্গী গোলপাতা সংগ্রহ করতে ব্যস্ত চামটার জঙ্গলের মধ্যে। একজন সঙ্গী অবশ্য তাদের পাহারার কাজে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু হঠাৎ কি হলো পাহারাদার বিমল রফতানকে আর দেখা যাচ্ছে না—তখন খোঁজ খোঁজ বিমল কোথায় গেল ? খোঁজ নিতে দেখা গেল যে বাঘের পায়ের দাগ সতেজ রয়েছে ও মাটিতে রক্তের দাগ। তবে বিমলকে নিশ্চয়ই বাঘে নিয়ে গেছে। মৃতদেহ উদ্ধার করতে

সকলেই দৃঢ় সঙ্কল্প—তারা রক্তের দাগ ও বাঘের পায়ের চিহ্ন লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল বনের মধ্যে। প্রায় এক কিলোমিটার যাওয়ার পর তাদের নজরে এল যে একটি বাঘ একটি মৃতদেহ ভক্ষণে ব্যস্ত। লোকজন কাছে আসায় বাঘ বিকৃত মুখভঙ্গী ও গর্জন করতে থাকল সেটার অর্থ বসন্ত রফতানের কাছে হচ্ছে যে বাঘটি নাকি মানুষজনের অকস্মাৎ আগমনে বেজায় চটেছে ও গর্জন করে তার মনের ভাব প্রকাশ করছে। এ সব দেখে তো তাদের দলের অন্য এক সঙ্গী শিবু মণ্ডল অচৈতন্য হয়ে পড়েছে ভয়ে পাথর হয়ে গেছে যেন। মাঝে মাঝে শিবু মণ্ডলের জ্ঞান আসছে আর মুখ দিয়ে "বাঘ, বাঘ, ভীষণ বাঘ" উচ্চারণ করছে। বাঘটি মৃতদেহ ছেড়ে বনের আরও ভিতরে চলে যাবার পরই শিবুকে সকলে ধরাধরি করে নৌকোতে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু শিবুর শরীরের তাপমাত্রা অত্যধিক হওয়ায় ও ঘুমের মধ্যে "বাঘ, বাঘ, ভীষণ বাঘ" মাঝে মাঝেই উচ্চারণ করার জন্য সে যাত্রা বসন্তদের কাজকর্ম বন্ধ রেখে গ্রামে চলে আসতে হয়। দীর্ঘ কুড়ি বছর হল সে ঘটনা ঘটেছে কিন্তু আজও নাকি শিবু ঘুমের মধ্যে "বাঘ, বাঘ, ভীষণ বাঘ" বকে চলেছে বসন্ত রফতান উল্লেখ করল। লাহিড়ীপুরের অনিল মৃধার কাছ থেকে সুন্দরবনের বাঘের কথা শুনছিলাম মনোযোগ দিয়ে। সেবার গোলপাতা সংগ্রহে যাওয়ার সময় অনিল ও অন্যান্য সঙ্গীরা একজন গুণিন সঙ্গে নিল। জঙ্গলে নামার পরই গুণিন গরান গাছের শিকড়ে হাত দিয়ে বার বার অস্ফুট মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগল ও বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে একটি সীমানা নির্দিষ্ট করল যার ভিতরে গোলপাতার কাজ করা চলতে পারে। কিন্তু অনিল মৃধার কৌতূহল হল সীমানার ধারে চলে গিয়ে বাইরে কি আছে দেখায়। দেখতে গিয়েই একটি বাঘকে কাৎ হয়ে শোয়া অবস্থায় দেখতে পেল। গুণিনের মতে বাঘটা নাকি তার মন্ত্রে সম্মোহিত হয়েছে। অনিল যারপর নাই ভীত হয়ে "বাঘ, বাঘ" বলে চীৎকার করতে করতে জীবন বাঁচাতে পালাতে লাগল। গুণিন সামনে এসে বাঘটিকে দেখে মন্ত্রের মধ্যে বাঘের উপস্থিতিতে তার অসন্তোষ ও অসম্মতি প্রকাশ করল। ভাগ্যক্রমে সে যাত্রা কোনও দুর্ঘটনা ঘটল না। কারণ বাঘটি ধীরভাবে জঙ্গলের ভেতরে চলে গেল।

সাতজেলিয়া গ্রামের ধীরেন মণ্ডলের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। মণ্ডলের সুন্দরবন সম্পর্কে প্রচুর অভিজ্ঞতা। সে বলতে লাগল বাঘ কিভাবে গ্রামে ঢুকে গ্রামবাসীদের ছাগল, গরু প্রভৃতি নিয়ে চলে যায়—কিন্তু ধীরেন মণ্ডলের মতে মানুষখেকো বাঘ নাকি কখনই গ্রামে ঢোকে না। আর যে দু একটি বাঘের মনুষ্য হত্যার ঘটনা ঘটে সেটি নিতান্তই কাকতালীয়—সে সব ক্ষেত্রে নাকি বাঘের

হত্যার কোন পূর্ব পরিকল্পনা থাকে না ও বাঘ অবস্থার বিপাকে পড়েই সে সব হত্যার ঘটনা ঘটাতে বাধ্য হয়। তাই তার জন্য সে বিশেষ অবস্থাই দায়ী বাঘ নয়। আমাকে ব্যাঘ্র চরিত্র সম্পর্কে এরূপ বহু উপদেশ ও জ্ঞান দিয়ে চলেছে ধীরেন মণ্ডল। আমার তখন মনে হল তার এ সকল বিবরণ অসত্য নয়—অন্যান্য সকল ঘটনার পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণও আমাকে এরূপ সিদ্ধান্তেরই ইঙ্গিত দেয়। ধীরেন মণ্ডল আরও বলল যে সাধারণতঃ কোনও পূর্ণবয়স্ক পুরুষ বাঘ নদী সাঁতরে গ্রামে আসে না। গ্রামে যারা আসে তারা সাধারণতঃ কম বয়সেরই হয়ে থাকে ও যারা এখনও জঙ্গলের ধরনধারণ ও শিকার প্রাণীদের সম্পর্কে এখনও পূর্ণ জ্ঞান আহরণ করতে পারেনি। এ সকল বাঘই কারণে অকারণে ঝুঁকি নিতে চায়। মনে হল জিম করবেট ও অন্যান্য বিখ্যাত প্রভৃতি বিশেষজ্ঞদের মানুষখেকো বাঘ সম্পর্কে ধারণা সুন্দরবন বাঘের ক্ষেত্রে ঠিক প্রযোজ্য নয়। কারণ অন্যান্য মানুষ খেকোরা কিন্তু লোকালয়ে সচরাচরই চলে আসে ও মানুষের মৃত্যুর কারণ ঘটায়। ধীরেন মণ্ডল আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করল। সাতজেলিয়া গ্রামে ধান ক্ষেতের মধ্যে কোন এক গুণিন নাকি একটি বাঘকে মন্ত্রপূত করে রেখেছে—এ খবর গ্রামে ছড়িয়ে পড়া মাত্রই প্রচুর লোকের ভিড় হয়েছে বাঘটিকে ঘিরে। কলকাতা ও আশপাশ থেকে কিছু শিকারীও জুটেছে বাঘটিকে গুলিবিদ্ধ করার জন্য। শিকারীরা খুব সুবিধাজনক জায়গা খুঁজে পেল না যেখান থেকে তারা বাঘটিকে গুলিবিদ্ধ করতে পারে। তখন তারা একটি কৃত্রিম ছদ্মবেশ তৈরী করল ও শিকারীরা তার মধ্যে নিজেরা আসন গ্রহণ করল। গুণিন শিকারীদের বাঘটিকে গুলিবিদ্ধ করার অনুমতি দিল একটি শর্তে যে মৃত বাঘটিকে তারা বনবিবির পুজোয় অর্ঘ্য হিসেবে দেবে। শিকারীরা রাজী হয়ে বাঘটিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। কিন্তু বাঘও অবস্থা বুঝে শিকারীদের লক্ষ্য করে লাফ দিল—যদিও বাঘের লক্ষ্যভ্রষ্ট হল কিন্তু আহত বাঘটি খালের কাছে একটি ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। শিকারীরা তখন পিছু নিলে সে আবার ধানক্ষেতের আগের জায়গায় ফিরে এল। গুণিন তখন ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে শিকারীদের গুলি করতে সক্রিয় সাহায্যে এগিয়ে এল। কিন্তু বিধি বাম। বাঘটি গুণিনের উপরে লাফ দিয়ে পড়ল ও তাকে গলায় ধরে নিয়ে যেতে উদ্যত হল। তখন শিকারীরাও আহত বাঘটিকে গুলিবিদ্ধ করে মেরে ফেলল।

কালীতলা গ্রামের নিবারণ মণ্ডল পেশায় মউলী—বিগত প্রায় কুড়ি পঁচিশ বছর ধরে সুন্দরবনে মধু সংগ্রহ করে আসছে। সে অসংখ্য ঘটনার নীরব সাক্ষী।

ইতিহাসের করুণতম ঘটনা তার কাছে দৈনন্দিন রুটীন মাফিক ব্যাপার। একদিন সুন্দরবন বাঘের প্রসঙ্গে নিবারণ মণ্ডলের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। মাতলা ব্লকের দুই নম্বর কমাটমেন্টের ঘটনা এটি—সম্ভবতঃ ১৯৬৮ সালের আট থেকে সাড়ে আট হবে সকাল। হাবিলা-দোয়ানিয়া নদীতে তখন উজ্জ্বল সকাল। দশজন মউলী নদীর পারে দাঁড়িয়ে সারিবদ্ধভাবে। গুণিনের মন্ত্রোচ্চারণের তালে তালে মউলীরাও মন্ত্র পড়ছে। হাবিলা দোয়ানিয়ার সর্পিল নদীর জল ফটিকের মত স্বচ্ছ, শান্ত ও কাঁচের মতই মসৃণ। মউলীদেরও গুণিনের মন্ত্র উচ্চারণ চলছে পুরোদমে যাতে ব্যাঘ্র দেবতাকে সম্মোহিত করা যায়। হঠাৎ একটি মৃদু ধপ শব্দ চারিদিকের নিস্তব্ধতাকে ভেঙ্গে দিল ও সারির মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা দেবেন মণ্ডলের দেহ একটি সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বাঘের মুখে দেখা গেল। বাঘটি দেহটিকে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে—এ দৃশ্যটা অনেকটা বিড়ালের মাছ নিয়ে পালানোর মতই। ঘটনার আকস্মিকতায় পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নিবারণ কিছুই টের পেল না—কিংকর্তব্যবিমূঢ়। অন্যান্য চারজন সঙ্গী এ দৃশ্য দেখে অজ্ঞান হয়ে গেল। বাকী সঙ্গীদের নিয়ে নিবারণ একটি মৃতদেহ উদ্ধারকারী দল তৈরি করে বাঘের পায়ের ছাপ ও রক্তের দাগ দেখে দেখে এগোতে লাগল। বহু বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তারা দেবেনের অর্ধ-ভুক্ত দেহ উদ্ধার করল। তারা দেখল যে পাকস্থলী প্রথমেই ভক্ষিত হয়েছে। দশ-এগারজন লোকের সামনে সুন্দরবন বাঘের আবির্ভাব সত্যিই বিরল ঘটনা ও বাঘটিকে মতলববাজ মানুষখেকো ছাড়া আর কিইবা বলা যেতে পারে, নিবারণ বলে চলল। নিবারণ আরও একটা কথা বলল যে দেবেনের দেহ যেন কুঁকড়ে অর্ধেক হয়ে গেছে। নিবারণের মতে বাঘের আক্রমণে মৃতের দেহের নাকি এরূপ রূপান্তরই ঘটে থাকে যার ফলে বাঘ অতি অনায়াসেই মৃতদেহগুলো বহন করে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। শুধু সুন্দরবনে কেন বাঙালীর মনেও বাঘ বাসা বেঁধেছে। কতশত রোমাঞ্চকর কবিতা কাহিনী লেখা হয়েছে তবুও মানুষখেকোর জীবন কাহিনীর তিলমাত্রও জানা হয়নি। বাংলার লোকসাহিত্যে 'সুন্দরবন-বাঘের' দুর্নিবার প্রভাব, লৌকিক দেবকুলে দক্ষিণ রায়ের (ব্যাঘ্র দেবতা) স্থান শীর্ষে। এর প্রভাব গ্রামে। গ্রামে জনে, জনে। মা নারায়ণী আছেন এই সঙ্গে কোথাও বা গহন বনের নিভৃত কোণে রকমারি মূর্তি (ব্যঘ্রদেবতা বড়খাঁ গাজী, বনবিবি, কালু খাঁ, সা-জংলী) দেখা যায়। ব্যাঘ্র দেবতার আক্রমণ থেকে নিরাপত্তার জন্য মউলে, বাউলে, মালঙ্গী, ধীবন নৌজীবি বন বিবির মূর্তিসহ দক্ষিণ রায়ের পূজা হয়। শ্রদ্ধার্পণ করা হয় এই বলে—

"চন্দ্রবদন চন্দ্রকায় শার্দুল বাহন দক্ষিণ রায়। ঢাল তরোয়াল টাঙ্গী হস্তে দক্ষিণ

রায় নমোহস্ততে।" কুমীর দেবতা কালু রায়ের পূজায় ঘটা সর্বত্র। পৌষমাসে গভীর বনে শত মত মৌল্লী, বাউলে জড় হয়, লাল নিশান, জ্বলন্ত মশাল, ঢাকে ঢোলে, কাঁসি, বাদ্য, পশুবলি, নৈবেদ্য, মদ্য, মাংস, গাঁজা ও ভাং-এর বিরাট সমাবেশ হয় এই পুজোতে। কোথাও বা চৈত্র সংক্রান্তিতে এদের পূজা হয়। লোক সংস্কৃতি অনুরাগী লেখক ঝুড়ি ঝুড়ি কাহিনী রচনা করে প্রমাণ করেছেন স্থানীয় লোকেদের জীবনে বন্য প্রাণীর অবিচ্ছেদ্য প্রভাব। ব্যাঘ্র উপাসনা এখানকার সমাজজীবনের বৈশিষ্ট্য। হিংস বন পশুসঙ্কুল সুন্দরবনে-এ প্রবেশের আগে নিরাপত্তার তাগিদে বনবিবির মন্ত্র বলা হয়—"মা বনবিবি, তোমার বল্লোক এল বনে, থাকে যেন মনে। শত্রু দুষমন চাপা দিয়ে রাখ গোড়ার কোণে। দোহাই মা বরকদের দোহাই মা বরকদের ॥" জীবনের নিরাপত্তার জন্য লোকেরা বনবিবির ফকির বা ওঝা নিয়ে যায় জঙ্গলে। ওরা ব্যাঘ্রকুলকে মন্ত্র বা বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা বশীভূত করে (ব্যাঘ্রবন্ধন)। কারণ এখানকার পশুশক্তির কাছে মানুষের শক্তি নিছক ছেলেখেলা। ঘন দুর্ভেদ্য বনাঞ্চল, দুর্গম পথচলা সীমিত পথচলার সামর্থ্য ও বিষধর সর্পসঙ্কুল বনপথে মানুষ অসহায়। তবু যেতে হয়—ওদেরও যেতে দিতে হয়।

দিল্লীর এক ব্যাঘ্র বিশারদ কদিন আগে বলছিলেন—

"শের নাওপর উঠকর লোগকো প্রায়শ
লে যাতা হ্যায়—য়্যাহ্ এক মামুলি কাহানি হ্যায়।"

চুপ করে শুনছিলাম আর ভাবছিলাম যে "Truth is stranger than fiction" ও আমাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তারের যে কত সুযোগ রয়েছে সেটাই বেশী করে মনে পড়ছিল। শতশত কাহিনী শুনেছি। দেখেছিও বহু দৃশ্য। সদ্যমৃতের চেহারাও দেখেছি। এ সব কাহিনী সভ্যজগতে অনাবৃত করবে পুত্রহারা মায়ের স্বামীহারা বিধবার অন্তরের মর্মস্পর্শী বেদনাময় ইতিহাস। গহন বনে দীর্ঘ দিন কাজ করার সুবাদে বহু কাহিনী শুনেছি। ঘটতে দেখেছি—তারই কিছু সত্য ঘটনা উল্লেখ করছি। ঘটনায় স্বাভাবিক কারণেই নামগুলোতে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। কিন্তু এ কাহিনীগুলো যেমন সুন্দরবনের অবস্থা, বা বাঘের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য তুলে ধরবে তেমনই সুন্দরবন মানুষের সামাজিক অর্থনৈতিক চিত্রও বহন করতে সাহায্য করবে।

গোসাবার গোলাম মহম্মদের তিরিশ বছরের জঙ্গল জীবনে আট জন লোক হারিয়েছেন বলতে লাগলেন—"১৯৭০ সালে আমাদের দুখানা নৌকায়

রান্নাবান্নার যোগাড় করছিলুম চামটার জঙ্গল—শেষ ভাটা। আমি ছিলুম গলুই-এর দিকে ডাংগার কাছে। হঠাৎ আমার সঙ্গী সামসের 'বাঘ বাঘ' বলে চিৎকার করে উঠে। আমি উঠে দাঁড়াতেই বাঘ লাফ দিয়ে আমার হাঁটু কামড়ে ধরে। আমি বাঘের মাথায় গায়ের জোরে ধাক্কা দিয়ে বললাম—এই শালা সরে যা, শিগগির সরে যা ; তক্ষুণি বাঘ লাফ দিয়ে পালিয়ে যায়। এই দেখুন আমার হাঁটুতে সে দাগ।" দাগ সত্যিই ছিল।

গোলাম মহম্মদ বলতে লাগলেন তিনি বাঘ তাড়ানো মন্ত্র জানেন। তিনি দুটো পুরুষ বাঘের এক বাঘিনীকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ দেখেছেন প্রায় দু ঘণ্টা ধরে নেতি ধোপানী ব্লকের মধ্যে। আবার চাঁদখালী ব্লকে এক বাঘ ও দুটো শুয়োরের এক ঘণ্টা ধরে মল্লযুদ্ধ দেখেছেন। মহম্মদের ধারণা পুরুষ বাঘ বাচ্চা খেয়ে ফেলে তাই বাঘিনী বাচ্চা নিয়ে গ্রামের কাছাকাছি চলে যায়।

"ক্ষুধার তাড়নায় বাঘ মাছ খেতে ভাটার সময় ছোট ছোট খালে নেমে আসে। তখনই জেলেদের আতঙ্কের মুহূর্ত। মানুষ মরে। নতুন মানুষখেকোর সৃষ্টি হয়। এরা মাছ খায়। নৌকোতে উঠে মানুষ নিয়ে যায়।" প্রভাস মণ্ডল ব্যাঘ্রচরিত্র সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে লাগল। আদি বাসস্থান পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) খুলনার সাতখিরায়। বর্তমানের হিঙ্গলগঞ্জে বাসস্থান প্রভাস মণ্ডলের। পিতার মাছ ব্যবসা সে এখন নিজে দেখে। 'বাবাকে এ জঙ্গলে বাঘ নিয়ে গেছে। আমারও হয়ত সে গতি হবে। কিন্তু এ ব্যবসা ছাড়া আমাদের অন্য কোন বাঁচার উপায় নেই'—বলে প্রভাস মণ্ডল।

বাঘ — স্বভাবে-আচরণে

বাঘের মত খুব কম প্রাণীই আছে যা কিনা মানুষের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। প্রাণীটির সাহসিকতা ও সৌন্দর্য্য কিংবদন্তী সৃষ্টি করেছে। আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য রাত্রিতে শিকার করার অভ্যাস, একাকী বিচরণের প্রকৃতি ও এড়িয়ে যাওয়ার ক্ষমতা এ প্রাণীটিকে রহস্য ও ভীতি প্রদর্শনের অদৃশ্য প্রভাব আস্তরণে আবৃত করে রেখেছে। ভারতবর্ষের বাঘ সম্পর্কীয় সর্বপ্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণ সিন্ধু সভ্যতার মহেঞ্জোদাড়োতে আবিষ্কৃত পাঁচ হাজার বছর পূর্বের শীলেও দেখা যায় যে একজন মানুষ গাছের উপরে বসে ক্রোধান্বিত হয়ে নীচে অবস্থানকারী বাঘের উদ্দেশ্যে কি যেন বলছে। যদিও কতিপয় বৈশিষ্ট্যের জন্য বাঘ ভীতির নিদর্শন হিসেবে পরিগণিত হয়েছে তথাপি এ প্রাণীটি প্রভূত প্রশংসা পেয়েছে প্রধানতঃ এর ক্ষমতা, গোপনীয় কর্মকাণ্ড, দ্রুতগতি, আক্রমণের নিষ্ঠুরতা ও নমনীয় সৌন্দর্য্যের অধিকারী বলে। কোরীয়বাসীরা বাঘকে পশুরাজ হিসেবে পরিগণিত করেছে ও শারীরিক সৌন্দর্য্য, শক্তি ও সাহসের উপমা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ওদেশের ও অন্যান্য দেশেরও বহু ক্রীড়া সংস্থা, সামরিক ও অসামরিক প্রতিষ্ঠান বাঘ প্রাণীটির নাম অনুকরণ করেছে। কাজেই শিকারীদের কাজে বাঘ প্রাণীটি যে একটি পরম আকাঙ্ক্ষিত বস্তু তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। শিকারীদের কাছে ব্যাঘ্রহত্যা তাই একটি পরম গৌরবের বিষয়—সে শিকার যেভাবেই হোক না কেন—তীর ধনুক দিয়ে ঘোড়ার পিঠে চরে (কোরিয়াতে এভাবে শিকার করা হত), গাছের মগডালে মাচান থেকে রাইফেল দিয়ে অথবা গাড়ার ভিতর থেকে—যেসব পন্থায় ভারতবর্ষে শিকার করা হয়ে থাকে। যদিও এ প্রাণীটির উপরে লেখা সাহিত্যের পরিধি ব্যাপক কিন্তু এর বেশীর ভাগই হচ্ছে শিকার সাহিত্য কিভাবে ও কি পরিস্থিতিতে বাঘ শিকার করা হয়েছে। বাঘের শক্তি, আকৃতি ও ব্যবহারগত দিকগুলোও তুলে ধরা হয়েছে

বিভিন্ন সাহিত্যিকদের নিবন্ধে। বাঘের প্রাকৃতিক ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণা হয়েছে প্রধানতঃ রাইফেলের নলের ভিতর থেকে দেখা দৃশ্যাবলী থেকে। গোয়ালিয়র ঢোলপুরের মহারাজা ও অন্যান্য রাজা মহারাজারাও দর্শকদের আকর্ষণ ও আনন্দ বিনোদনের জন্য বাঘ সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করেছেন ও এর পরিসংখ্যানগত গবেষণার বিষয়বস্তু পাওয়া যায় না।

এখন সুন্দরবনের বাঘকে সাধারণের সামনে আনতে চাই,যাতে পাঠকেরা প্রাণীটির ব্যবহারগত বৈশিষ্ট্যের কথা জানতে পারেন। বিভিন্ন লৌকিক উপাখ্যানেরও উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন ব্যাঘ্রপ্রজাতির মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্য কমই আছে। এ প্রসঙ্গে প্রকৃতিবিজ্ঞানী ক্র্যানডালের মতে (১৯৬৪); "While the tigers of the frigid north are large, long coated,and pale in colour, there is a gradual reduction in size andlengthof the coat as well as a deepening of colour towards the south, so that the island races are noticeably small, dark and short haired"

বর্তমান 'ফেলিডি' পরিবারের সর্ববৃহৎ সদস্য এ বাঘ ও এ পরিবারের বেশীর ভাগ সদস্যদের মতই বাঘও শিকার প্রাণীর অলক্ষ্যে সতর্কতার সঙ্গে নিকটবর্তী হওয়ার ক্ষমতা অর্জন করেছে। নমনীয় শারীরিক গঠন, হ্রস্ব গ্রীবা, নিবিড় ও আঁটসাঁট মস্তক ও অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব মুখবন্ধনী যার সঙ্গে রয়েছে বেশ ভয়ানক এক পাটি শ্বাদন্ত। অতি মজবুত ও স্বাভাবিক দৈর্ঘ্যের পা, সামনের অংশ পিছনের অংশ থেকে অপেক্ষাকৃত বেশী মাংসবহুল ও শক্তিশালী ও প্রশস্ত থাবাগুলি সঙ্কোচনীয় নখ দিয়ে আচ্ছাদিত এ বাঘ প্রাণীটির প্রকৃতিবিজ্ঞানী বেকারের (১৮৯০) মতে: "A well-fed tiger is by no means a slim figure, but on the contrary it is exceedingly bulky, broad in the shoulders, back and loins, with an extraordinary girth of limbs, especially in the fore-arm and wrist. পুরুষেরা মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশী লম্বা ও পুরুষদের ওজনও অনেক বেশী হয়। ১৯২৩ সালে প্রকৃতি বিজ্ঞানী ব্রান্ডারের নিবন্ধে উল্লেখিত আছে যে পুরুষ বাঘের দৈর্ঘ্য লেজসহ ২৬০ সেন্টিমিটার থেকে ৩০৭ সেন্টিমিটার পর্যন্ত ও মেয়ে বাঘের দৈর্ঘ্য ২৩৫ সেন্টিমিটার থেকে ২৭২ সেন্টিমিটার পর্যন্ত। সাধারণত পুরুষ বাঘের দৈর্ঘ্য (লেজ ছাড়া) ১৯০ সেন্টিমিটার ও লেজের দৈর্ঘ্য ৯০ সেন্টিমিটার গড়ে হয়ে থাকে। গড়ে প্রতি

মেয়ে বাঘের দৈর্ঘ্য ১৫ থেকে ৩০ সেন্টিমিটার কম হয়ে থাকে পুরুষ বাঘ থেকে। বাঘের ওজনের বহু তথ্য বিভিন্ন নিবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে, প্রকৃতি বিজ্ঞানী ব্রান্ডারের প্রকাশিত নিবন্ধে উল্লেখ রয়েছে যে পুরুষ বাঘের গড় ওজন ৪২০ পাউন্ড (৩৫৩ থেকে ৫১৫ পাউন্ড) ও বুকের বেড় ৪০ সেন্টিমিটার। মেয়ে বাঘের গড় ওজন হিসেবে ব্রান্ডার ৩৯টি বিভিন্ন প্রাণীর ওজন থেকে পেয়েছেন ২৯০ পাউন্ড। সব থেকে বেশী মেয়ে বাঘের ওজন পেয়েছেন ৩৪৩ পাউন্ড।

সুন্দরবন জঙ্গলে দীর্ঘ দশ বছরে বেশ কয়েকটি বাঘকে মাপজোখ করার সুযোগ পেয়েছি। এর থেকে যে পরিসংখ্যান পেয়েছি তার উল্লেখ করা প্রয়োজন কারণ প্রকাশিত সাহিত্যে সুন্দরবন বাঘের মাপজোখের বিশেষ উল্লেখ নেই, কিছু অনুমান ভিত্তিক সংখ্যাতত্ত্ব কোথাও কোথাও অবশ্য উল্লেখ আছে।

একটি সুন্দরবনের পূর্ণবয়স্ক পুরুষ বাঘের গড় পরিসংখ্যান নিম্নরূপ :

লেজ সহ বাঘের দৈর্ঘ্য	:	২৬১ সেন্টিমিটার
কেবলমাত্র লেজের দৈর্ঘ্য	:	৭৭ সেন্টিমিটার
লেজের বেড়	:	
মূলে	:	২৩ সেন্টিমিটার
ডগায়		৪ সেন্টিমিটার
বেড়ের পরিসংখ্যান	:	
মাথার বেড়	:	৭৬ সেন্টিমিটার
গলার বেড়	:	৬৩ সেন্টিমিটার
বুকের বেড়	:	১১০ সেন্টিমিটার
পায়ের ছাপ		১৪ সেন্টিমিটার
দাঁতের পরিসংখ্যান		
সামনের দাঁত	:	
লম্বা	:	৫ সেন্টিমিটার
চওড়া	:	১০ সেন্টিমিটার
বেড়		৭ সেন্টিমিটার
পিছনের দাঁত	:	
লম্বা	:	৪ সেন্টিমিটার
চওড়া	:	৪ সেন্টিমিটার

একটা তথ্য লক্ষণীয় যে সুন্দরবনের পুরুষ বাঘের লেজের দৈর্ঘ্য ভারতবর্ষের অন্যান্য সমগোত্রীয়ের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম যদিও সুন্দরবন বাঘের মোট দৈর্ঘ্য অন্যান্য বাঘের মোট দৈর্ঘ্যের প্রায় সমান সমান। অর্থাৎ লেজছাড়া দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে সুন্দরবন বাঘের গড় দৈর্ঘ্য হয়ত অন্যান্য বাঘের তুলনায় কিঞ্চিৎ বেশী। সুন্দরবন বাঘের বুকের বেড়ের পরিমাপও অন্যান্য সমগোত্রীয় বাঘের চেয়ে বেশী। সুন্দরবন বাঘের দৈর্ঘ্য ২০৫ থেকে ২৭৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত (লেজ সহ)। মস্তিষ্কের পরিমাপ করার সুযোগও হয়েছে। তাতে দেখা গেছে যে মস্তিষ্কের দৈর্ঘ্য ৮ থেকে ৯ সেন্টিমিটার ও প্রস্থ ৭ থেকে ৮ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।

বাঘের দৈর্ঘ্যের সঙ্গে পায়ের ছাপের কোন পরিসংখ্যানগত সম্পর্ক আছে কিনা এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে প্রায় ৪০০ পায়ের ছাপ সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লক কমাটমেন্টের বনাঞ্চল থেকে সংগ্রহ করে, প্লাস্টার-অফ-প্যারিস দিয়ে তুলেছি ও মাটিতে পায়ের ছাপের মাপজোকও নিয়েছি। সামনের পা ও পিছনের পায়ের মধ্যেকার পার্থক্যেরও মাপ নিয়েছি সকল ক্ষেত্রেই। প্রাণীতত্ত্বের প্রয়োজনে এরূপ পরিসংখ্যান ভিত্তিক সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রয়োজন সর্বাধিক ও অন্য কোন বনাঞ্চলে কোনও প্রকৃতি বিজ্ঞানী অবশ্য এরূপ পরিসংখ্যানভিত্তিক গবেষণা করেছেন বলে জানা যায়নি। তাই এ গবেষণার তুলনামূলক বিচার করা সম্ভব হচ্ছে না। ৪০০টি বাঘের পায়ের ছাপের ও সামনের পিছনের পায়ের মধ্যেকার দূরত্বের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ :

সামনের পায়ের ছাপ (সেন্টিমিটার) (লম্বা ও প্রস্থ)	পিছনের পায়ের ছাপ (সেন্টিমিটার) (লম্বা ও প্রস্থ)	সামনের পা ও পিছনের পায়ের দূরত্ব (সেন্টিমিটার)
৭·৫×৮·৫	৬·৫×৭·৫	৭৫
১১×৯	৯×৮	১১২
৯·৫×১২·৫	১০·৫×১১	১১৫
১৩×১১	১৩×১১	১২২
১৩·৫×১২·৫	১২·৫×১১·৫	১২৫
১১·৫×১৪	১২·৫×১৪	১৩০
১৪×১৪·৫	১৩×১৪·৫	১৩৫
১৪×১৬	১৪×১৬	১৪০
১৭×১৬	১৭×১৬	১৪৫

যেহেতু বিভিন্ন মাটিতে পায়ের ছাপ পড়ে বিভিন্নভাবে বিস্তৃত হয়ে পড়ে—সেহেতু প্রতিটি প্রকারের মাটিতে পায়ের ছাপ নিয়ে তার গড় নির্ণয় করা হয়েছে যাতে মাটির বিভিন্নতা পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে কোনও রূপ প্রভাব ফেলতে না পারে। উপরিউক্ত পরিসংখ্যানের সারণী থেকে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ সম্ভব হয়েছে সামনের ও পিছনের পড়া পায়ের ছাপের ভিতরকার দূরত্বের সঙ্গে পায়ের ছাপের সঙ্গে। তাছাড়া বাঘের পূর্ণ দৈর্ঘ্যের সঙ্গে এরূপ সামনের ও পিছনের পায়ের ভিতরকার দূরত্ব মেপে অন্য আর একটি পরিসংখ্যানগত সম্পর্কের ফর্মূলা নির্ধারিত হয়েছে। এভাবে এ দুই সম্পর্ককে পরিসংখ্যানগতভাবে একত্র করে একটি সূত্র নির্ধারিত হয়েছে যার দ্বারা কোন বাঘের পায়ের ছাপ থেকে তার দৈর্ঘ্য নিরূপণ করা সম্ভব। সূত্রটি হচ্ছে :—

Y = ২০৬·৯৭+০·৩৩×

যখন Y হচ্ছে বাঘের দৈর্ঘ্য (সেন্টিমিটারে)

X হচ্ছে পায়ের ছাপের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের গুণিতক (বর্গ সেন্টিমিটারে)

যদি X জানা থাকে তবে Y উপরের সূত্র থেকে পাওয়া যাবে।
বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ সূত্রটি প্রয়োগ করে এর নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণিত হয়েছে।
পরিসংখ্যানগত ব্যাঘ্রসুমারীর ভিত্তিতে বাঘের সংখ্যার আনুপাতিক হার পায়ের ছাপের শ্রেণী ভেদে ৭×৬, ৭ থেকে ১০×৬ থেকে ১০, ১০ থেকে ১৫×১০ থেকে ১৫, ১৫ থেকে ২০×১০ থেকে ১৫, ১৫ থেকে ২০×১৫ থেকে ২০ (সবই সেন্টিমিটারে) : ১ : ১ : ৯ : ৭ :১

অর্থাৎ সুন্দরবন বাঘের বাচ্চা ও অতিপরিণত বয়স্কদের আনুপাতিক হার অপেক্ষাকৃত কম। ১৯৭২, ১৯৭৭ ও ১৯৮৪ সালের সুন্দরবনে ব্যাঘ্রসুমারীর ফলাফল নিচে প্রদত্ত হল ব্লক অনুযায়ী।

১৯৭৭ ও ১৯৮৪ সালের সুন্দরবন ব্যাঘ্রপ্রকল্পে ব্যাঘ্রসুমারীর ফলাফল :—

ব্লক		পুরুষ বাঘ	মেয়ে বাঘ	বাচ্চা বাঘ	মোট
পীরখালি	(ক)	৮	১০	১	১৯
	(খ)	১০	৯	২	২১
পঞ্চমুখানি	(ক)	৪	৫	৫	১৪

সুন্দরবনে ব্যাঘ্রসুমারী

ঘুমপাড়ানি গুলিতে বিদ্ধ সুন্দরবনের বাঘ

	(খ)	১০	১২	—	২২
নেতিধোপানি	(ক)	৪	৫	৩	১২
	(খ)	১	২	—	৩
ঝিলা	(ক)	৩	৫	৮	১৬
	(খ)	৮	৭	২	১৭
আরবেশী	(ক)	৬	৯	০	১৫
	(খ)	১২	৯	৪	২৫
খাটুয়াঝুরি	(ক)	৪	৫	২	১১
	(খ)	৯	৭	—	১৬
চাঁদখালি	(ক)	৫	৫	২	১২
	(খ)	৬	১০	—	১৬
চামটা	(ক)	৮	৮	০	১৬
	(খ)	১৯	১২	—	৩১
হরিণ ভাঙ্গা	(ক(	৪	৪	—	৮
	(খ)	৪	৪	—	৮
মাতলা	(ক)	৪	৫	২	১১
	(খ)	৭	৭	১	১৫
ছোটোহর্দী	(ক)	৪	৪	৩	১১
	(খ)	৬	৫	১	১২
গোসাবা	(ক)	৫	৭	১	১৩
	(খ)	১২	১০	১	২৩
মায়াদ্বীপ	(ক)	৬	৭	৩	১৬
	(খ)	১৪	৯	—	২৩
বাগমারা	(ক)	৯	১০	৩	২২
	(খ)	১৪	৬	১	২১
গোণা	(ক)	৩	৩	৩	৯
	(খ)	৫	৬	—	১১
মোট	(ক)	৭৭	৯২	৩৬	২০৫
	(খ)	১৩৭	১১৫	১২	২৬৪

সুন্দরবনে ২৪ পরগনা ডিভিসনের অন্তর্গত বনাঞ্চলে ব্যাঘ্রসুমারী ১৯৮৪ সালের ফলাফল :—

ব্লক	পুরুষ বাঘ	মেয়ে বাঘ	বাচ্চা বাঘ	মোট
হেরোভাঙ্গা	২	৩	—	৫
আজমলমারী	৭	৩	১	১১
দুলিভাসানী	২	—	—	২
চুলকাটি	৩	২	—	৫
মোট	১৪	৮	১	২৩

ভারতবর্ষে মোট বাঘের সংখ্যা (ব্যাঘ্রসুমারী অনুযায়ী)

সাল	বাঘের সংখ্যা
১৯৭২	১৮২৭
১৯৭৯	৩০১৫
১৯৮৩	৩৫০০

১৯৭৯ সালের ১১টি ব্যাঘ্র প্রকল্পে বাঘের মোট সংখ্যা ৭০৪টি ও তার মধ্যে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পে বাঘের সংখ্যা ছিল ২০৫ ও দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে উত্তর প্রদেশের করবেট (সংখ্যা ৮৪)

বাঘের গায়ের রঙ কমলা-লাল থেকে পিঙ্গল-হলুদ মেশানো হয়ে থাকে তার সঙ্গে আড়াআড়ি ভাবে অবস্থিত বিভিন্ন লম্বা ও চওড়ার কালো ডোরা কাটা। ঠোঁট, গলা, পেট ও কান ও পায়ের মধ্যেকার অংশগুলি সাদা। কানের পিছনের অংশ কালো ও কানের কেন্দ্র বিন্দুতে একটি স্পষ্ট সাদা দাগ রয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে ও বিভিন্ন প্রজাতিদের মধ্যে গায়ের উপরকার ডোরা বিভিন্নরকম হয়ে থাকে। চোখের উপরের সাদা চুলের কালো কালো দাগগুলো এতই স্পষ্ট থাকে যে সযত্ন পর্যবেক্ষণের ফলে একটি প্রাণীকে অন্যটি থেকে আলাদা করে চেনা সম্ভব হয়। সুন্দরবনে হেতাল ও গোলপাতার বনে বাঘের অবস্থিতি সহজে বোঝা যায় না কারণ হেতাল ও গোলপাতার বনের রঙও পিঙ্গল-হলুদ হয়ে থাকে বিশেষতঃ যখন এ সকল গাছের ফুল ও ফলের সময়ে। বাঘের ছদ্মবেশ ধারণের

পক্ষে তাই সুন্দরবনের হেতাল-গোলপাতার বনাঞ্চল প্রকৃষ্ট স্থান হিসেবে চিহ্নিত।

বাঘের ভৌগোলিক বিস্তৃতি একসময় প্রায় দশ হাজার কিলোমিটার ছিল—কাম্পিয়ান সাগর ও উর টুর্কের আরারত পর্বতমালা থেকে রাশিয়ার মাঞ্চুরিয়া পর্যন্ত। পশ্চিমদিকে বিস্তৃতি হয়েছে উত্তর আফগানিস্তান ইরান ও সোভিয়েত রাশিয়ায়। উত্তরে বল্‌খাস ও উরাল হ্রদ ও কাম্পিয়ান সাগর পর্যন্ত। কিন্তু বর্তমানে উত্তর ইরান ও দক্ষিণ টুর্কমেনিয়া ছাড়া এ প্রজাতির অস্তিত্ব প্রায় বিলীন। চীন দেশের সর্বত্রই বাঘের সগর্ব উপস্থিতি বিরাজমান ছিল। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে শিকার ও বনধ্বংসের স্বাভাবিক পরিণতিতে বাঘের অস্তিত্ব আজ ঐ দেশে প্রায় বিলীন বলা যায়।

যদিও বাঘ প্রাণীটি রাশিয়ায় মাঞ্চুরিয়ায় ছিল বৈকাল হ্রদ ও ইয়াবলো পাহাড় থেকে ওখোট্‌স্ক সমুদ্র পর্যন্ত তথাপি বর্তমানে ৭০ থেকে ৮০টির বেশী প্রাণী আজ অবশিষ্ট নেই। তাও সেসকল রয়েছে উসুরী নদীর উপত্যকায়। উত্তর ভিয়েতনাম, লাওস, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া ও বার্মায় বাঘের বিস্তার ভালভাবেই ছিল। ১৯৫০ সালে প্রকৃতিবিজ্ঞানী লক হিসেব করেছিলেন যে তিন হাজারের মত বাঘ মালয়ে রয়েছে ও লক্ষ্য করেছিলেন যে এমনকি ১৯৫০ সালেও সিঙ্গাপুরে বাঘের চলার চিহ্ন পাওয়া গেছে। বোর্নিয়তে অবশ্য বাঘ কখনও ছিল না, কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জগুলিতে—পূর্বে বালি পর্যন্ত বাঘের বিস্তার ছিল। সুমাত্রা, জাভা ও বালিতে বাঘের ক্ষীণ অবস্থিতি উল্লেখিত আছে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বাঘের সগর্ব উপস্থিতি বিরাজমান আসাম থেকে পশ্চিমদিকে ভূটান ও নেপাল হয়ে হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তর প্রদেশ ও রাজস্থান থেকে দক্ষিণ প্রান্ত। কিন্তু সিংহল দ্বীপপুঞ্জে এ প্রজাতির উপস্থিতির কোনও নির্ভরযোগ্য তথ্য মেলে না। কোন এক সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধু উপত্যকায়ও ব্যাঘ্র প্রজাতির অস্তিত্ব বিরাজমান ছিল কিন্তু প্রকৃতিবিদ বার্টনের (১৯৫২) মতে শেষ প্রাণীটিকে এ অঞ্চলে রাইফেলের গুলিতে মারা হয়েছে ১৮৮৬ সালে।

এ বিরাট ভৌগোলিক বিস্তৃতি এ প্রাণীটির বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার ক্ষমতাই প্রমাণ করে এবং প্রকৃতপক্ষে এ প্রাণীটির বেঁচে থাকার পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় তিন সামগ্রী হচ্ছে—আশ্রয়স্থল, পানীয় জল ও যথেষ্ট সংখ্যক শিকার প্রাণী। পশ্চিমদিকের জলা স্যাঁতসেতে আশ্রয়স্থল থেকে শুরু করে আড়াই হাজার মিটার উচ্চতা পর্যন্ত এ প্রাণীটির অবস্থিতি লক্ষ্যণীয়।

পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের জলকাদার স্যাঁতসেতে 'ম্যানগ্রোভ' বনাঞ্চল বাঘের একটি প্রকৃষ্ট আশ্রয়স্থল। প্রকৃতিবিদ অগনেভ ১৯৬২ সালে এক প্রতিবেদনে বলেছেন যে সিডার বনাঞ্চল ও পার্বত্য অঞ্চল (৬০০ মিটার থেকে ১৫০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত) বাঘের অতি প্রিয় বনভূমি। মাঞ্চুরিয়া—৩০ ডিগ্রী ফারেনহাইট থেকে ইন্দোচীন, বর্মা ও ইন্দোনেশিয়ায় উষ্ণ ও স্যাঁতসেঁতে বনাঞ্চল কম্বোডিয়া ও থাইল্যান্ডের ঘাসের বন ও উত্তর সুমাত্রা ও সুন্দরবনের 'ম্যানগ্রোভ' বনাঞ্চল এ সকলই হচ্ছে বাঘের আশ্রয়স্থল।

ভারতবর্ষের প্রায় সকল শ্রেণীর বনাঞ্চলেই বাঘের অস্তিত্ব রয়েছে—কাটা-গুল্ম, শুষ্ক ও আর্দ্র পর্ণমোচী বনাঞ্চল, চির সবুজ ও অন্যান্য বনাঞ্চল যথা 'ম্যানগ্রোভ' বনাঞ্চল প্রভৃতি যেখানে বাঘ ও অন্যান্য প্রাণী উভচরের মত জীবন যাপন করে থাকে ও জোয়ারের জল যেখানে প্রায় দশ মিটার পর্যন্ত উপরে উঠে যখন সমগ্র বনাঞ্চল জলের নিচে চলে যায়। আসামের কাজিরাঙ্গার লম্বা ঘাসের বনাঞ্চলও বাঘের অনায়াস আশ্রয়স্থল হিসেবে চিহ্নিত। পশ্চিম ঘাটের পর্বতমালার প্রায় তিন হাজার মিটার উচ্চতা পর্যন্ত ঘাসের আচ্ছাদিত বনাঞ্চলে বাঘের অস্তিত্ব বিরাজমান। হিমালয়ের পাদদেশে পাইন ও ওক বনাঞ্চলে অবশ্য বাঘের উপস্থিতি চোখে পড়ে না যদিও বাঘের উপস্থিতি সে সকল অঞ্চলে এক হাজার পাঁচ শত মিটার উচ্চতা পর্যন্ত রয়েছে। প্রকৃতিবিদ টার্নার, বলাউন ও হিউয়েট অবশ্য দু হাজার থেকে চার হাজার মিটার পর্যন্ত দু একটি বাঘের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছেন। কিনলক ও গুপ্তের মতে অবশ্য বাঘ চার হাজার মিটার থেকে সাড়ে চার হাজার মিটার পর্যন্ত কখনও কখনও দেখা গেছে—এ সকলই কিন্তু আজ ইতিহাসের বস্তু। অতীতকালে বাঘের সংখ্যা নিরূপণের আর একটি পরোক্ষ নিদর্শন হচ্ছে শিকার—বিবরণ। ১৮৬৩ ও ১৮৬৪ সালে গর্ডন-কামিং নর্মদা নদীর পার্শ্বে একটি জেলা থেকেই একটি বাঘ শিকার করেছেন বলে জানা যায়। তাপ্তি নদীর ধারে পাঁচ দিনে দশটি বাঘও শিকার করা হয়েছে। কোনও এক শিকারী ১৯১১ সালে একত্রিশ দিনে একুশটি বাঘ শিকার করেছে বলেও জানা গেছে। প্রায় একটি বাঘ একটি দিনে। পঞ্চম জর্জ ও তাঁর সঙ্গীরা ১৯১১-১২ সালে নেপালে এগারো দিনে উনচল্লিশটি বাঘকে শিকার করেছেন বলে জানা যায়।

নেপালের মহারাজা ও তাঁর অতিথিবর্গ ১৯৩০ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত সাত বছরে ৪৩৩টি বাঘ ও ৫৩টি গণ্ডার শিকার করেছেন বলে জানা যায়; কর্নেল নাইটেঙ্গেল পূর্ববর্তী হায়দ্রাবাদ রাজ্যে ৩০০টি বাঘ শিকার করেছেন;

বিজয়ানা গ্রামের মহারাজ সাড়ে তিন শতর বেশী বাঘ শিকার করেছেন। সুরগুজার মহারাজ ও ১১৫০টি বাঘ শিকার করেছেন বলে গর্ব প্রকাশ করেছেন। গুজরাট, পাঞ্জাব ও কাশ্মীর উপত্যকা ব্যতিরেকে ভারতবর্ষের প্রায় সকল রাজ্যেই বাঘের সদর্প উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। প্রাণীতত্ত্ব বিজ্ঞানী প্রেটার এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন যে ১৯২৯ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ১০৭৪টি বাঘ শিকারের সরকারী অনুমতিপত্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে দেওয়া হয়েছে। ১৯৩৯ সালের পরেও প্রায় সমপরিমাণে না হলেও প্রচুর পরিমাণে সরকারী অনুমতিপত্র বাঘ শিকারের জন্য দেওয়া হয়েছে। মানুষের লোভ, হঠকারিতা, শিকারের অশুভ প্রতিযোগিতা বনাঞ্চল হ্রাস, জনসমষ্টির মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণগুলিই বাঘের সংখ্যা হ্রাসের জন্য প্রধান।

বাঘের প্রজনন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রকাশিত নির্ভরযোগ্য তথ্যের যথেষ্ট অভাব। নিউইয়র্ক চিড়িয়াখানায় এক বাঘিনী তিন বছর আট মাসে যৌনবিষয়ক পরিপূর্ণতা অর্জন করেছে বলে প্রকাশ। প্রকৃতিবিজ্ঞানী পোককের মতে একটি বাঘিনী কেবলমাত্র দু বছর বয়সে বাচ্চা দিয়েছে। এটিও একটি চিড়িয়াখানাতেই ঘটেছে। ঠিক কত বয়সে বাঘিনী যৌন পরিপূর্ণতা অর্জন করে এ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ রয়েছে। প্রকৃতি বিজ্ঞানী ব্ল্যানড্‌ফোর্ড যৌনপূর্ণতার বয়স তিন বছর বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন কিন্তু অন্য দুই বিশেষজ্ঞ এব্রা যোভ ও নোভিকোভ চার বছর বলেছেন। প্রাণী বিজ্ঞানী বডির মতে বাঘের বন্দীদশায় যৌনমিলন শুরু করে দু থেকে আড়াই বছরের মধ্যে। কিন্তু সিংহের ক্ষেত্রে অনুরূপ বয়সটি হচ্ছে তিন বছর বন্দীদশার ক্ষেত্রে। কিন্তু বন্য পরিবেশে সিংহের যৌনপরিপূর্ণতা চার বছরের পূর্বে সাধারণতঃ আসে না—প্রকৃতি বিজ্ঞানী গুগিমবার্গের অভিমতে। অ্যাসডেল ও ক্যানডেলের মতে 'ফেলিড়ি' পরিবারের সভ্য বা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে ঋতুবিশেষে যৌন বিষয়ক বহু মিলনের অভ্যস্ত অথচ গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে উক্ত পরিবারের সভ্যবৃন্দ যৌনবিষয়ক বহুমিলনের কোন বিশেষ ঋতুর উপর নির্ভরশীল হয় না। আমার অভিজ্ঞতায় সুন্দরবনের বাঘ কিন্তু বন্দীদশার থেকে বেশ কিছুটা বিলম্বিত বয়সে যৌনপূর্ণতা অর্জন করে ও যৌন মিলনের জন্য অবশ্যই কোন বিশেষ ঋতুর উপরে নির্ভরশীল নয়। ম্যানভারসান বাঘের নবজাত বাচ্চা মার্চ, মে, অক্টোবর ও নভেম্বরে দেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। বার্টন মার্চ, এপ্রিল ও ডিসেম্বর মাসে নবজাত বাঘের বাচ্চা দেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। বিজ্ঞানী ব্র্যাণ্ডার বলেছেন যে বেশীরভাগ বাঘের বাচ্চার জন্ম হয় নভেম্বর ও এপ্রিল মাসে।

বিজ্ঞানী রাইসের মতে জুন মাসই হচ্ছে বাচ্চা জন্মানোর প্রকৃষ্ট মাস। ইন্দোচীন ও দক্ষিণ ভারতে নভেম্বর ও এপ্রিল মাসে যৌন মিলন সব থেকে বেশী ঘটে বলে জানা যায় কিন্তু মালয়ে উক্ত সময় হচ্ছে নভেম্বর থেকে মার্চের মধ্যে। প্রাণী বিজ্ঞানী বৈকভ ও অকনভের মতে মাঞ্চুরিয়ার বাঘের যৌন মিলনের সময় ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে। আমি আমার দশ বছরের অভিজ্ঞতায় সুন্দরবনে আমি যে পাঁচটি বাঘের সদ্যজাত বাচ্চা দেখেছি সেগুলির একটি বাদে সমস্তই জানুয়ারী থেকে মার্চ পর্যন্ত। একটি বাচ্চা আমি দেখেছিলাম নভেম্বর মাসে। যদিও সুন্দরবন অঞ্চলে যাদের আরও দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাদের মতে সুন্দরবনে বাঘের বাচ্চা জন্মানোর নাকি কোন বিশেষ মাস নেই অর্থাৎ প্রায় সব মাসেই নাকি বাচ্চা দেখা গেছে। বাঘিনীর গর্ভধারণকাল নিয়েও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। জুকারম্যানের মতে উক্ত সময় হচ্ছে ৯৪ থেকে ১০৯ দিন। ক্যানডেলের মতে ১০০ থেকে ১০৪ দিন। অ্যাব্রামোভের মতে ৯৫ থেকে ১০৭ দিন। একসঙ্গে প্রসূত শাবকসমূহের সংখ্যা নিয়েই মতভেদ লক্ষ্যণীয়। কোন কোন বিজ্ঞানীদের মধ্যে উক্ত সংখ্যা এক থেকে সাতের মধ্যে—অন্যান্যরা অবশ্য এক থেকে চার, এক থেকে পাঁচ প্রভৃতি বলেছেন। সুন্দরবনের ক্ষেত্রে এরূপ সংখ্যা এক থেকে তিন বলে মনে হয়—যদিও শতকরা আশিভাগ ক্ষেত্রে এক, শতকরা পনেরো ভাগ ক্ষেত্রে দুই ও শতকরা মাত্র পাঁচ ভাগ তিন হিসেবে ধরা যেতে পারে। নিউইয়র্ক চিড়িয়াখানায় একটি বাঘিনীর ১৯৭৩ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত এগারো বছরে এগারো বার বাচ্চা হয়েছে অর্থাৎ গড়ে প্রতি বছরে একবার করে। বিভিন্ন প্রাণীতত্ত্ববিদ যথা ইংলিশ, বার্টন, ব্র্যান্ডার সকলেই বলেছেন যে বাঘের বাচ্চারা জন্মানোর দু'বছর পর্যন্ত বাঘিনীর উপরে নির্ভরশীল থাকে। তাই যদি বাচ্চারা বেঁচে থাকে তবে সাধারণতঃ প্রতিটি বাঘিনীর প্রতি দুই থেকে আড়াই বছর পর্যন্ত বাচ্চা জন্মানোর সম্ভাবনা। কিন্তু সুন্দরবনের ক্ষেত্রে বাঘের বাচ্চাদের নির্ভরশীলতার বয়স সীমা কিছুটা কম বলেই আমার ধারণা। কারণ এক থেকে দু' বছরের বাচ্চাদের আলাদাভাবে সুন্দরবন জঙ্গলে দেখা যাওয়ার ঘটনা কোনমতেই বিরল নয়। সুন্দরবন জঙ্গলের স্বাভাবিক নিরাপত্তা কি বাঘিনীদের বিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে বাচ্চাদের স্বাধীন জীবন যাপন সম্পর্কে ? চিড়িয়াখানায় বাঘেদের জীবনকাল কুড়ি বছরের মত। বন্যজীবনে জীবনকালের সীমাও কুড়ি বছরের নীচেই। তাই যদি কোনও বাঘিনীর চার বছর বয়সে বাচ্চা হয় ও প্রতি বছর একটি বাচ্চা হয়ে থাকে ও যদি বাঘিনীর জীবনকাল আঠেরো বছর হয় তবে উক্ত বাঘিনী তার

জীবনকালের মধ্যে চোদ্দটি বাচ্চার জন্ম দিয়ে থাকবে। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় যদি কোনও বাঘিনী এর অর্ধেক সংখ্যক বাচ্চারও জন্ম দিয়ে থাকে তবে সে অবস্থাকে নিশ্চয়ই সন্তোষজনক বলে ধরা যেতে পারে। পুরুষ বাচ্চা মেয়ে বাচ্চা থেকে অনেক আগেই স্বাধীন জীবন যাপন করতে শুরু করে। বাঘের স্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনার ক্ষেত্রে সুন্দরবন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জোয়ারের জলে বা ঝঞ্ঝার দাপটে বাঘের বাচ্চা অনেকক্ষেত্রেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সমুদ্রের ঢেউ এ মৃত্যু ঘটানোর জন্য অনেককাংশেই দায়ী। যেহেতু সুন্দরবনে পুরুষ বাচ্চারা অনেক আগেই স্বাধীন জীবনযাপন করতে শুরু করে তাই। তাদের জীবনের ঝুঁকিও অনেককাংশেই বেশী। ছোট ছোট এ সকল বাচ্চারা কুমীর, বন্যশূকর, হাঙর, বন্যমেছোবিড়াল প্রভৃতির শিকার হয়। তাই সুন্দরবনে বাঘের বাচ্চার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা অন্যান্য অঞ্চল থেকে কম। সুন্দরবনের গভীর জঙ্গল ও তীক্ষ্ণ ফলার মত বায়বীয় শিকড় যে কোনও প্রাণীর চলাফেরার পক্ষে বেশ বিপজ্জনক। বাঘের ছোট বাচ্চার পক্ষে তাই এ জঙ্গলের পরিবেশ বিপদের সংকেত বহন করে। তাই ত পূর্ণবয়স্ক বাঘ ও বাঘিনীর তুলনায় সুন্দরবনে বাচ্চার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। বহু প্রাণীতত্ত্ববিজ্ঞানী যথা ফরসিথ, ফিন, পাওয়েল, অ্যান্ডারসন, অগনেভ প্রভৃতির মতে পূর্ণবয়স্ক পুরুষ বাঘ খুব ছোট বাচ্চাকে হত্যা করতে অভ্যস্ত। কিন্তু সুন্দরবনের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটনার কোনও প্রমাণ নেই। স্বাভাবিক পীড়াকে বাঘের মৃত্যুর জন্য দায়ী করা যায় না। বার্টন দুটি রক্তক্ষয়ী কীটের কথা উল্লেখ করেছেন বাঘের মৃত্যুর কারণ হিসেবে। এ কীটদ্বয় বাঘের মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ ঘটাতে সহায়তা করে। সুন্দরবন বাঘের পরিত্যক্ত মল সংগ্রহ করে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে ঐ সকল মলে ডাইফাইলো বোথরিয়াম এবিনেতি, টিনিয়া পিসিফরমিস, মনিজিয়া বেনেড়েলি, পারাপোনিয়াস, টোক্সোকারা প্রভৃতি কীট পাওয়া যায়। কিন্তু এ সকলের মধ্যে টোক্সোকারা কীটের উপস্থিতিই সবচেয়ে বেশী (শতকরা ষাট ভাগ) ও দ্বিতীয় হচ্ছে পারাপোনিয়াস কীট। মনিজিগা কীট বাঘের পাকস্থলী অভ্যন্তরে প্রবেশ করে গোলযোগ ঘটায়। পারাপোনিয়াস নামক কীটের সেবক হচ্ছে বিড়াল, কুকুর, ছাগল, শুকর ও এমনকি মানুষ। এ কীটের প্রথম ও দ্বিতীয় মধ্যস্থ সেবক হচ্ছে শামুক ও কাঁকড়া। সুন্দর বন বাঘ কাঁকড়া খেতে অভ্যস্ত। পরিত্যক্ত মল থেকে এ তথ্য প্রমাণিত হয়েছে।

বাঘের গতিবিধি ও সীমা সম্পর্কে বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতদ্বৈধ রয়েছে। গভীর জঙ্গলের পরিবেশের মধ্যে বাঘের গতিবিধির পর্যবেক্ষণও অতি কঠিন ও

কষ্টসাধ্য কাজ। তাই বেশীরভাগ পরিসংখ্যান সংগৃহীত হয়েছে পরিচিত প্রাণীদের দর্শন পরিসংখ্যানগুলো সময় ও স্থান বিশেষে লিপিবদ্ধ করার মধ্যে ও তাদের গমনাগমনের পথ অনুসরণ করে। বাঘের জমি দখল পদ্ধতি নিয়েও মতান্তরের অন্ত নেই বিশেষজ্ঞদের মধ্যে। বিজ্ঞানী লকের মতে একটি পুরুষ বাঘের নিজস্ব জমির দখলসীমা রয়েছে ও সে সীমার মধ্যে অন্য কোন বাঘকে সে প্রবেশ করতে দেবে না। আবার বিজ্ঞানী বার্গ বলেছেন যে কোনও পুরুষ বাঘ অন্য কোন পুরুষ বাঘকে তার নিজস্ব ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে বাধা দেবে কিন্তু অনুপ্রবেশকারী মেয়ে বাঘদের ক্ষেত্রে সেরকম কোনও বিধিনিষেধ নেই। প্রফেসর লেহাউসনের মত হচ্ছে যে বাঘেদের ভূমির সীমা এতই বড় যে সব সময় তা পাহারা দেওয়া বাঘেদের ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। কিন্তু অন্যদিকে ব্যান্ডার বা বেজ প্রভৃতি বিশেষজ্ঞদের মতামত অবশ্য অন্যরকম। ব্র্যান্ডার ১৯২৩ সালে একসঙ্গে তিনটি পুরুষ বাঘ দেখেছেন ও বেজ ১৯৫৭ সালে তো দুটো পুরুষ বাঘকে একটি ছোট দ্বীপে গুলিই করেছেন। হয়ত বাঘের ভূমিক্ষেত্র সম্পর্কীয় পদ্ধতি পরিবর্তিত হয় বিশেষ বিশেষ পরিবেশের প্রভাবে—যথা, পানীয় জল বা আশ্রয়ের অপ্রতুলতা বা শিকার প্রাণীর অভাব সুন্দরবন বাঘের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট ভূমিক্ষেত্র বা দখল পদ্ধতি প্রমাণিত হয়নি। ছোট ছোট দ্বীপে (দুই বর্গ কিলোমিটার) দু থেকে তিনটি পুরুষ বাঘকে দেখা গেছে একই সঙ্গে বছরের পর বছর। প্রকৃতি বিজ্ঞানী গুগিমবার্গ সিংহের ভূমিক্ষেত্র দখল পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে এক জায়গায় বলেছেন :

"For the lioness, the Teritory means simply a hunting ground, while for the lion it is a region containing a certain number of lionesses which from time to time are ready to mate with him. The territory of a lion can therefore encompass the hunting grounds of various family and single lionesses..."

সুন্দরবনে জমির দখল নিয়ে যে মতবাদ, তা সেখানকার বাঘেদের সুন্দরবন জঙ্গলের ক্ষেত্রে জমির দখল সম্পর্কীয় মতবাদ বাঘেদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলে আমার ধারণা। এর অবশ্য অনেক কারণ আছে। বড় বা ছোট নদী ও খাল দিয়ে একটি বন অন্য বন থেকে আলাদা। মাটি ও জলের লবণাক্ততার তারতম্য ও ফলার মত তীক্ষ্ণ বায়বীয় শিকড় বাঘের জমি দখল পদ্ধতিতে ব্যাঘাত ঘটায়। তাছাড়া বাঘ প্রাণীটি যে কোনও পরিবেশে এতই মানিয়ে চলতে অভ্যস্ত যে

শিকার প্রাণী, আশ্রয়স্থল ও পানীয়জল এ তিনটি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের যোগান হলেই তারা যে কোনো পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপন করতে পারে। আর একটি মতবাদ হচ্ছে প্রকৃতি বিজ্ঞানী ম্যানডারসনের "when a tiger becomes old and fat, he usually settles down in some locality where beef and water are plentiful, and here he lives on amicable terms with the villagers, killing a cow or bullock about once in four or five days."

সুন্দরবনে বাঘের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বস্তু হচ্ছে যে বাঘেরা এক বন ছেড়ে অন্য বনে প্রায়শঃই আশ্রয় গ্রহণ করে ও বৃদ্ধ ও শিকারে অপারগ হলে মানুষের বসতির নিকটবর্তী বনাঞ্চলে চলে আসে। প্রায়শঃই দেখা যায় যে বৃদ্ধ বাঘ সুন্দরবন অঞ্চলের সজনেখালি অভয়ারণ্যে আশ্রয় নিয়েছে। জুন-জুলাই মাস থেকে আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত যখন সজনেখালি অভয়ারণ্যে পাখীর সমাগম হয় তখন এ অভয়ারণ্য বৃদ্ধ বাঘের আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। পাখীরা ডিম ও বাচ্চা মাটিতে পাড়ে ও গোসাপরাও তখন অতিতৎপর হয় সে সকল গ্রহণ করার জন্য। এ সমস্ত কিছুই বাঘের আকর্ষণের বস্তু হয়ে ওঠে। তবে মানুষ খেকো বাঘেরাই এরূপভাবে এক বন থেকে অন্য বনে মানুষের শিকারে বেশী করে ঘুরে বেড়ায়। এরূপ গমনাগমনের ঘটনার প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। ব্যাঘ্রপ্রকল্প সুন্দরবনে শুরু হওয়ার পর থেকে দেখা গেছে যে কোর এরিয়ার মানুষখেকো বাঘেরা বাফার জোনের দিকে বেশী করে আসছে সম্ভবত মনুষ্য শিকারের প্রয়োজনে। কারণ কোর এরিয়া তে তো কাঠ কাটা থেকে শুরু করে অন্য সব বনসম্পর্কীয় বাণিজ্যিক কাজকর্ম বন্ধ তাই প্রবেশের ঘটনাও অত্যন্ত কম। সুন্দরনের বাঘের যদিও কোন নির্দিষ্ট জমির দখলসীমা নেই অর্থাৎ এককথায় রাজত্ব বিহীন রাজা তথাপি তাদের কার্যাবলীর একটি কেন্দ্রবিন্দু অবশ্যই রয়েছে যেখানে সে বেশী সময় ধরে থাকে তার শিকারের পন্থাপদ্ধতি নির্ণয়ের জন্য। সে স্থানটি অবশ্যই অপেক্ষাকৃত উঁচু জমি হবে ও সাধারণ জোয়ার ভাটায় জলে ডুবে যায় না। হেতাল-গেওয়ার বা অন্য কোন ঘন জঙ্গল বাঘের আশ্রয়স্থল হিসেবে প্রিয়। হেতালের হলুদ—সবুজ ঘনত্ব বাঘেদের নিজেদের হলুদ ডোরার আত্মগোপনে সহায়তা করে থাকে—তাই বোধ হয় হেতাল বন বাঘেদের আশ্রয়স্থল হিসেবে এত প্রিয়। আশ্রয়স্থলের কেন্দ্রটি এমনভাবে নির্বাচন করা হয় যাতে বাঘ শিকার প্রাণী নির্বাচন ও তাদের অবস্থিতি নির্ণয় করতে পারে। অর্থাৎ বাঘ যে স্থান থেকে সবচেয়ে ভাল ভাবে বহুদূর অবধি দেখতে পারে ও শিকার

প্রাণীদের আওয়াজ বা অন্যান্য পরোক্ষ আওয়াজ শুনতে পারে। বাঘের এ দুটি ইন্দ্রিয়ই সবচেয়ে বেশী প্রবল। বাঘের ঘ্রাণশক্তি সম্বন্ধে অবশ্য বিশেষজ্ঞদের মধ্যেও মতদ্বৈধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন বাঘের ঘ্রাণশক্তি অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মতই সমানভাবে প্রবল আবার অন্য অনেক বিশেষজ্ঞ মতপ্রকাশ করেছেন যে বাঘের ঘ্রাণশক্তি যদিও যথেষ্ট প্রবল কিন্তু তা বাঘের শ্রবণ বা দৃষ্টি শক্তি অপেক্ষা দুর্বলতর। অন্যান্য অঞ্চলের বাঘ সম্পর্কে আমার কোন মন্তব্য নেই তবে সুন্দরবন বাঘ সম্পর্কে আমার সুচিন্তিত মতামত হচ্ছে যে এর ঘ্রাণশক্তি দৃষ্টি বা শ্রবণশক্তি অপেক্ষা অবশ্যই দুবর্লতর। এ প্রসঙ্গে আমার এক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা এখানে উল্লেখ করছি। আমি কোনও একদিন ঠিক করলাম যে বাঘের শ্রবণ, দৃষ্টি বা ঘ্রাণ কোন্‌টি বেশী শক্তিশালী ও বাঘ ঠিক কিভাবে শিকার করে সেটার জন্য একটা পরীক্ষা করব। কিন্তু কিভাবে সেটা করা যাবে। আমি তখন সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের অধিকর্তা। সুন্দরবনে গোসাবা বনাঞ্চলের ব্লকের মধ্যে (যার পরিচিত নাম হল্‌দি) নজরমীনারের উপর থেকে পর্যবেক্ষণ করব এ পরীক্ষার কর্মকাণ্ড। পরীক্ষাটা হচ্ছে একটি পোষা শূকরকে নজরমীনারের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রেখে বাঘের আপেক্ষিক প্রতিক্রিয়া নজর করা। আমি রাত্রিবেলা লঞ্চ থেকে খাওয়াদাওয়া সেরে ও সঙ্গে পরের দিনের খাওয়াদাওয়া জল সঙ্গে নিয়ে নজরমীনারের উপরে উঠে বসলাম। নীচে শূকরটি বাঁধা। সারা রাত ধরে শূকরটির প্রাণান্তকর চীৎকার আমার অপরাধ চেতনাকে বাড়িয়ে তুলছিল যে, অকারণে নিরপরাধ প্রাণী হত্যার কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেললাম এ মনে করে। কিন্তু সূর্য ওঠার আগে থেকেই লক্ষ্য করলাম যে শূকরটি চীৎকার তো করছেই না বরং প্রায় সম্পূর্ণ ভাবলেশ শূন্য-প্রায় অর্ধমৃত অবস্থা। নিশ্চয়ই বাঘ ধারে কাছে এসেছে। একথা ভাবতে ভাবতেই দেখলাম কয়েকটা পাখীর হঠাৎ উড়ে যাওয়া। হল্‌দি জায়গাটি সম্পর্কে একটু বলা প্রয়োজন। হল্‌দি নদী থেকে প্রায় চারশ' মিটার দূরে একটি নজরমীনার তৈরী করা হয়েছে যেখানে রাতেও থাকা যায় পর্যবেক্ষণের সুবিধার্থে। নজরমীনারের সঙ্গেই কাটা হয়েছে একটি পুকুর যেখানে অলবণাক্ত জলের যোগান রয়েছে। পুকুরের পারে বন্য প্রাণীদের সুবিধার্থে কৃত্রিম খাদ্য যোগানের ব্যবস্থাও আছে। হল্‌দি স্থানটি নির্বাচনের একটি বিশেষ কারণ হল এখানে কিছু মিষ্ট জলের উপযোগী গাছপালা রয়েছে যেগুলি মানুষেরই সৃষ্ট—বট, অশ্বত্থ, তমাল প্রভৃতি গাছ নির্দিষ্ট দূরত্বে লাগান রয়েছে গেওয়া-সুন্দরী বনের মধ্যে। এ গাছগুলি কে বা কাহারা লাগিয়েছিল সঠিকভাবে জানা নেই। কারুর ধারণা এ স্থানটি জলদস্যুদের আশ্রয়স্থল ও ঐ সকল

জলদস্যুই এ সব গাছ লাগিয়েছিল। কেউ কেউ অবশ্য এ মতবাদে বিশ্বাসী নয়। বীজ জলে ভেসে এসে এ গাছগুলো হয়েছে এরূপ ধারণাও অনেকের। কিন্তু গাছগুলির মধ্যে নির্দিষ্ট দূরত্ব মনুষ্য সৃষ্ট বনের মতবাদকেই প্রমাণ করে। যাই হোক্ এরূপ স্থানে রাত কাটাবার পরে জ্যান্ত টোপ শূকরটির অবস্থা দেখে সত্যিই খারাপ লাগছিল। সাধারণতঃ ভোরের দিকে বিভিন্ন পাখীর আওয়াজ শোনা যায়। কিন্তু সেদিন হল্‌দি বনাঞ্চলে অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করছিল। কৌতূহল বেড়ে গেল। পর্যবেক্ষণ সারির দিকে লক্ষ্য করলাম। দূরে একটি বন্য শূকরকে অতিদ্রুত পালিয়ে যেতে দেখলাম বনাভ্যন্তরে আমার বাইনকুলার দিয়ে। ক্যামেরা নিয়ে আমি তৈরি রয়েছি যে কোন পরিস্থিতির জন্য। এর মধ্যে কেবলমাত্র খুঁটিতে বাঁধা টোপ শূকরের ছবি নিয়েছি মাত্র যেটি প্রায় অর্ধমৃত। হঠাৎ পুকুরের পারে ও নজরমীনারের উল্টোদিকে দেখলাম যে একটি বাঘ বসে আছে। তার দৃষ্টি বনের অভ্যন্তরে। নজরমীনারে উপবিষ্ট মানুষ বা খুঁটিতে বাঁধা শূকর নয়। আমি তখন ক্যামেরা ক্লিক করা শুরু করে দিয়েছি। প্রায় মিনিট পনেরো অবধি এ জিনিস চলল। হঠাৎ বাঘের কি খেয়াল হল বনের ভিতরে চলে গেল। দূরে দেখা শূকর বাঘের লক্ষ্যবস্তু কিনা কে জানে। তারপর বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল—বাঘের দেখা নেই। পাখীর কলকাকলী চিতল হরিণের টিউ টিউ কানে আসতে লাগল। কিন্তু বিকেলের দিকে হঠাৎ আবার কি হল কোন এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে আবার যেন শান্ত নিস্তব্ধতা ফিরে এল হল্‌দি বনাঞ্চলে। তবে কি বাঘ আবার আসছে নজরমীনারের কাছাকাছি। ভাবতে ভাবতেই দেখলাম যে ভোরবেলা বাঘটিকে যে স্থানে দেখেছিলাম সে স্থানে আবার অকস্মাৎ আবির্ভাব। হঠাৎ কি কারণে বাঁধা শূকর মৃদু আওয়াজ করে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবনের বাঘ স্বমূর্ত্তি ধারণ করল। বাঘটি উঠে পড়ে বনের ভিতরে চলে গিয়ে আস্তে আস্তে এগোতে লাগল বাঁধা টোপের দিকে বনের আড়ালে আড়ালে। প্রায় তিরিশ ফুটের মত দূরত্বে এসে বাঘ তার নিজের শরীর মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিল ও বিদ্যুৎ গতিতে প্রায় অর্ধমৃত শূকরের উপরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল ও পিছনে ঘাড়ের উপর আঘাত করল শূকরটিকে। শূকরের অর্ধাংশ সঙ্গে নিয়ে বাঘটি বনের অভ্যন্তরে চলে গেল। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে যখন ফিরে এল তখন হল্‌দি বনে অন্ধকার নেমে এসেছে। শুকরটি একটি নাইলন দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল। তাই বোধ হয় অর্ধাংশ নিয়ে বাঘটি চলে গেল। কিন্তু ফিরে এসে অন্ধকারে বাঘটি নজরমীনারের উপরের দিকে নিরীক্ষণ করতে লাগল—এমনভাবে করতে লাগল যেন নজরমীনারের উপরে উপবিষ্ট মানুষটিকে

অনুরোধ করল দয়া করে স্পট লাইট ফেলতে যাতে শূকরের বাকী অর্ধাংশ সহজেই গ্রহণ করতে পারে। স্পট লাইট ফেলার প্রয়োজন নিজেরও ছিল ছবি তোলার স্বার্থে। তাই আমার সঙ্গী স্পট লাইট ফেলতে লাগল। বাঘ তখন শূকরের বাকী অর্ধাংশ গ্রহণ করেও বনের মধ্যে চলে গেল। এ পরীক্ষা বাঘের ঘ্রাণশক্তির দুর্বলতাই প্রমাণ করে। কারণ ভোরবেলা বাঘটি যখন এসেছিল সে মানুষ ও বাঁধা শূকরের কোন ঘ্রাণ পায়নি ও বিকেলেও সে কোন ঘ্রাণ পায়নি কিন্তু শূকরের সামান্য শব্দই বাঘের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করেছে। অন্ততঃ এটা প্রমাণিত হয় যে সুন্দরবন বাঘের শ্রবণশক্তি ঘ্রাণশক্তি থেকে অনেক বেশী। আর বাঘের শিকার পদ্ধতিও বিশেষ ধরণের, শিকার প্রাণী যতই ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ হোক না কেন শিকারের পদ্ধতির বিশেষ তারতম্য নেই।

শিকার দেখেই নিজেকে আড়াল করার প্রবণতা বাঘের সহজাত তীক্ষ্ণ ও চাতুর্যেরই পরিচয়। আর খানিকটা দূর থেকে এসে শেষ লাফটি সত্যিই বিদ্যুতের গতির সঙ্গে তুলনীয়।

বাঘের সামাজিকজীবন সম্পর্কে চলতি ধারণা হচ্ছে যে, বাঘ একটি অসামাজিক প্রাণী, যারা কিনা একাকী জীবনযাপনে অভ্যস্ত। চীনা ভাষায় একটি প্রবাদ চালু আছে "One hill cannot shelter two tigers." বাঘের সামাজিকজীবন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রকৃতিবিজ্ঞানী ইংলিশ (১৮৯২) লিখেছেন : In their habits they are very unsociable, and are only seen together during the mating season. When that is over the male betakes himself again to his solitary predatory life..." কিন্তু সকলেই যে এরূপ ধারণা পোষণ করে থাকেন তা নয়। প্রকৃতিবিজ্ঞানী ফরসিথের (১৮৮৯) মতে "I have twice known five, and once, seven, tigers to be driven out of one cover." বিজ্ঞানী বার্গের (১৯৩৬) মতে "One often meets tiger and tigress in company; they kill and eat an animal together and campa few days near each other. But they soon part again."

কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ধারণা কিন্তু ফরসিথ ও বার্গের মতামত থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সুন্দরবনের বাঘ সাধারণতঃ একাকী জীবনেই অভ্যস্ত বলে আমার ধারণা, অবশ্য যৌনমিলন ক্ষেত্র ব্যতিরেকে। শিকারের ক্ষেত্রেও অনেক সময় একটি বাঘ অন্য বাঘের সঙ্গে মিলিত হতে দেখেছি। বাঘের ক্ষেত্রে শ্রেণীগত পর্যায়

নির্বাচিত হয় মূলতঃ আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে—পুরুষ বাঘ শ্রেণীগত পর্যায়ের প্রথম সারিতে, তারপরে রয়েছে একটি বাচ্চা সমেত বাঘিনী ও তারপরে চারটি বাচ্চা সমেত বাঘিনী। সুন্দরবনের 'বাঘমারা' নামক বনাঞ্চলে একদিন লক্ষ্য করলাম যে একটি বাঘিনী ও দুটি বাচ্চা যখন একটি মৃত শুয়োর ভক্ষণে ব্যস্ত তখন একটি পুরুষ বাঘ এসে তার খানিকটা দূরে সমস্ত ঘটনা প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে লক্ষ্য করল ও কেবলমাত্র বাঘিনী ও বাচ্চা যখন সে স্থান পরিত্যাগ করল তখনই পুরুষ বাঘটি মৃত শুয়োরের কাছে গেল আহারের উদ্দেশ্যে। আর একবার সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প অঞ্চলের বাফার জোন এলাকার নেতি ধোপানী বনাঞ্চলে প্রায় চার ঘণ্টা ধরে লক্ষ্য করলাম যে একটি পুরুষ বাঘ মৃত চিতল হরিণের কাছে অপেক্ষমান কারণ তখন একটি বাঘিনী তার বাচ্চা নিয়ে মৃত চিতল হরিণ আহারে ব্যস্ত। এরূপ ব্যবহারগত বৈশিষ্ট্য থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে বাঘ একাকী জীবনযাপনে অভ্যস্ত হলেও কিন্তু অসামাজিক প্রাণী নয়। 'ফেলিডি' পরিবারের বেশীরভাগ সদস্যই এরূপ একাকী জীবনযাপনে অভ্যস্ত সিংহকে বাদ দিয়ে। শিকার প্রাণীর অপ্রতুলতা, পরিবেশের প্রতিকূল অবস্থা, অরণ্যের গভীরতা ইত্যাদি কারণগুলি বাঘের একাকী জীবনের জন্য মুলতঃ দায়ী, অন্য দিকে সিংহ অত্যন্ত সামাজিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত। সিংহের প্রিয় আবাসস্থল হচ্ছে ঘাস ও সাভানা জাতীয় বনভূমি। অগভীর বনভূমি প্রভৃতি আশ্রয়স্থলের প্রত্যক্ষ প্রভাব তাদের সামাজিক প্রাণী হিসেবে গড়ে তুলেছে। সুন্দরবনের ক্ষেত্রে বাঘের একাকীত্ব অন্যান্য বনাঞ্চলের থেকে বেশীমাত্রায় বলেই মনে হয়—কারণ পরিবেশের প্রতিকূলতায় সুন্দরবন ব্যাঘ্র মানচিত্রের শীর্ষস্থানে রয়েছে। লবণাক্ত জল, জোয়ার ভাটায় ওঠানামা, জলের কুমীর কামটের অবস্থান, বিভিন্ন ম্যানগ্রোভ বৃক্ষ প্রজাতির সুতীক্ষ্ণ শিকড় ও বনাঞ্চলের গভীরতা প্রভৃতি পরিবেশকে প্রতিকূল করে তুলেছে। তাই ত এ প্রতিকূলতা বাঘকে ঘিরে আরো বেশী করে বিভেদের প্রাচীর গড়ে তুলেছে অন্যান্য প্রাণীকূল থেকে।

নিজেদের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান করার পদ্ধতিও বাঘেদের ক্ষেত্রে অনন্য—এ আদান-প্রদান করা হয় শব্দ, অঙ্গ-ভঙ্গী প্রভৃতির দ্বারা। এ ছাড়াও বাঘেদের একাকীত্ব ও নিশাচর প্রবৃত্তির জন্য তারা বিচরণ পথেও তাদের উপস্থিতির বিশেষ কতকগুলি চিহ্ন রেখে যায় যার ফলে অন্যান্যরা সহজেই তাদের বিচরণ ক্ষেত্র সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য লাভ করতে পারে। প্রকৃতিবিদ লকের মতে (১৯৫৪) যে পুরুষ ও মেয়ে বাঘ তাদের বিচরণের ক্ষেত্রে গন্ধ ছড়িয়ে দেয় ও ত্যাগ করা মলমূত্রও তাদের উপস্থিতির সাক্ষ্য দেয়। বাঘেরা

তাদের বিচরণ ক্ষেত্রে খানিকটা গিয়ে কিছু থামে, লেজটাকে শরীরের সঙ্গে সমকোন তৈরী করে একজাতীয় তরল পদার্থ নির্গমন করে যা কিনা গাছ ও অন্যান্য লতা গুল্মের উপরে মাটি থেকে তিন থেকে চার ফুট উঁচু পর্যন্ত ঐ তরল পদার্থ বিচ্ছুরিত হয় যা থেকে বাঘের উপস্থিতি বোঝা যায়। এ তরল পদার্থটি পরিষ্কার, ফিকে হলুদ রঙের হয়ে থাকে। স্বাভাবিক ভাবেই তরল পদার্থটিকে প্রস্রাব হিসেবে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু এ তরল পদার্থটি প্রস্রাব থেকে পৃথক—বাঘের প্রস্রাবের সাধারণতঃ বিশেষ কোন দৃঢ় গন্ধ থাকে না কিন্তু এ তরল পদার্থটির মৃগনাভিবাসিত দুর্গন্ধ বিশ ফুট দূর থেকেও সহজেই মানুষের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে। মলদ্বার থেকে নির্গত এ পদার্থটি গৃহে পালিত বিড়ালের মধ্যেও দেখা যায় ও এর গন্ধ গাছের শাখায় বা পাতার উপরে দু-তিন সপ্তাহ অবধি অনায়াসে পাওয়া যায়। এ তরল পদার্থের নির্গমনের আরো একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যনীয় যে বাঘ তার স্বাভাবিক গমনাগমনের পথে যাত্রা বিরতির সময়ে, কোনও বাঁক নেওয়ার সময় অথবা অন্যান্য কারণেও এ তরল পদার্থ নির্গমন করে থাকে। কখনও কখনও দেখা যায় যে এ তরল পদার্থ নির্গমনের পরে পরেই বাঘ প্রস্রাব করে থাকে। তবে তরল পদার্থ নির্গমনের সঙ্গে প্রস্রাব করার কোন ধনাত্মক পরিসংখ্যানগত সম্পর্ক আছে কিনা তা অবশ্য এখনও সঠিকভাবে জানা যায়নি। এ ব্যাপারে আরও গবেষণার ক্ষেত্রে অবশ্য এ তরল পদার্থের উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষিত হয় না কারণ জোয়ারের জলের ওঠানামার ফলে উক্ত পদার্থটির চিহ্ন সহজেই গাছের শাখা বা পাতা প্রভৃতি স্থান থেকে মুছে যায়। তরল পদার্থ নির্গমন সিংহের ক্ষেত্রেও ঘটে থাকে। এডামসনের (১৯৬০) মতে : "Elsa was now eighteen months old and I noticed, for the first time, that she had, temporarily as it proved, developed a strong smell. She has two glands, known as the anal glands, under the root of her tail ; these exuded a strong-smelling secretion which she ejected with her urine against certain trees, and although it was her own smell she always pulled up her nose in disgust at it."

বাঘ-সিংহ পরিত্যক্ত তরল পদার্থটি কিন্তু বেশ কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহে সাহায্য করে থাকে : (১) তরল পদার্থটির গন্ধ একে অপরকে তাদের গমনাগমন সম্পর্কীয় প্রয়োজনীয় সূত্র সরবরাহ করে (২) বাঘ-সিংহের গমনাগমন ক্ষেত্র চিহ্নিত করে—ও এর ফলে এ সকল প্রাণীকুলের বিচরণক্ষেত্র সহজেই

বোঝা সম্ভব হয়। (৩) কোনও বিশেষ প্রাণীর গমনাগমনের সময় ও ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ এর ফলে সম্ভব হয়। প্রকৃতি বিজ্ঞানী লেহাউসন ও উল্‌ফের (১৯৫৯) সুচিন্তিত মতামত হচ্ছে যে পরিত্যক্ত তরল শদার্থটি অনেকটা রেলওয়ের নিদর্শন চিহ্ন হিসেবে কাজ করে থাকে যার ফলে প্রাণীকুলের বিপদসঙ্কুল ও ক্ষতিকারক সাক্ষাৎকার এড়ানো সম্ভব। যথা একেবারে তাজা চিহ্ন থাকার অর্থ হচ্ছে বিপদসঙ্কুল সাক্ষাৎকারের আশঙ্কা। অপেক্ষাকৃত কম তাজা চিহ্ন হলে বুঝতে হবে যে অতি সাবধানে অগ্রসর হওয়া ও পুরোনো চিহ্ন হলে বুঝতে হবে যে অগ্রসর হওয়া নিরাপদ। বাঘিনীকে চলতি কথায় বিড়ালের মাসি বলে বলা হয়ে থাকে, অবশ্য একই 'ফেলিডি' পরিবারভুক্ত দুই প্রাণী। একের আবাস মানুষের গৃহে ও অন্যের গহন বনে। তাছাড়া প্রকৃতিগত প্রচুর প্রভেদ রয়েছে। বিড়াল তার নিজের পরিত্যক্ত মলমূত্র ঢেকে রাখার চেষ্টা করে কিন্তু বাঘের মধ্যে এরূপ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় না। তাই বাঘের পরিত্যক্ত মলমূত্র প্রভৃতি সহজেই মানুষের নজরে পরে। সুন্দরবন বাঘের বেলায় এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। সুন্দরবনের মতলববাজ মানুষখেকোরা অবশ্য তাদের পরিত্যক্ত মলমূত্র মানুষের চোখ থেকে আড়াল করার চেষ্টা করে ও বহুক্ষেত্রেই এ সকল শ্রেণীর বাঘের মলমূত্র মানুষের বিশেষ নজরে পরে না। মানুষখেকো বাঘের স্বভাব বৈচিত্র্য সঠিকভাবে উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে বহুবার মানুষখেকো বাঘকে অনুসরণ করেই এরূপ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। পরিসংখ্যানগত ভাবে বলতে গেলে প্রায় কুড়িবার মানুষখেকো বাঘের অনুসরণ করে একবার মাত্র পরিত্যক্ত মলমূত্র সংগ্রহ করার সুযোগ পেয়েছি তাও ঝোপ-ঝাঁড়ের মধ্যে মাটি ও পাতায় ঢাকা। মানুষখেকো বাঘের অতিধূর্ত ব্যবহার বৈশিষ্ট্যই কি এরূপ মলমূত্র আড়াল করার প্রবণতা এনে দেয়? এ ব্যাপারে অবশ্য আরও সুনির্দিষ্ট গবেষণার অবকাশ রয়েছে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় একপ্রকার গোবরে পোকা উক্ত পরিত্যাগ করা মলমূত্র মাটি চাপা দিতে সাহায্য করে থাকে।

চার : সুন্দরবনের বাঘ অন্যদের থেকে আলাদা

প্রকৃতির রাজ্যে এরূপ কত বিচিত্র বিচিত্র সম্পর্ক যে লুকিয়ে আছে তার ইয়ত্তা নেই। পীরখালী, আরবেশী, ছোটোহর্দী, বাগমারা, গোনা প্রভৃতি ব্যাঘ্রপ্রকল্প অঞ্চলের ব্লকে বহুবার মানুষখেকো বাঘকে অনুসরণ করার সুযোগ হয়েছিল কিন্তু কোথাও তাদের মলমূত্র সন্ধান করতে সফল হইনি। এরূপ গবেষণামূলক ভ্রমণ করতে গিয়ে মানুষখেকো বাঘের আরও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে গেল। সুন্দরবন ব্যাঘ্রপ্রকল্প অঞ্চলে সে বছর মাতলা, ছোটোহর্দী ও গোসাবা ব্লকে পর পর সাতটি মনুষ্য মৃত্যুর ঘটনা ঘটল—লোকজন নিয়ে ও আত্মরক্ষা ও সঙ্গীসাথীদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম মানুষখেকো বাঘের রহস্য সন্ধানে। ঘুরতে ঘুরতে গোসাবা ব্লকে এসে পৌঁছলাম। সে বছর বন্যপ্রাণীদের জন্য কৃত্রিম জলাশয় তৈরীর কোন এক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল উক্ত ব্লকের হল্‌দি নামক বনাঞ্চলে। কৃত্রিম জলাশয়ের পাশে বন্যপ্রাণীদের দর্শনের সুবিধার জন্য নজরমীনারও তৈরী হচ্ছিল। নদীর পার থেকে নজরমীনারে যাওয়ার সুবিধার জন্য একটি মাটির রাস্তাও তৈরি করা হয়েছে। অনুসন্ধিৎসা নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে নজর করলাম যে একটি বাঘের পায়ের ছাপ জঙ্গলের ভেতর থেকে মাটির রাস্তার ধার পর্যন্ত এসে আবার জঙ্গলের দিকে ফিরে গেছে—কোনও ক্ষেত্রেই মাটির রাস্তা অতিক্রম বা অনুসরণ করতে দেখা যায়নি। সদ্য খুঁড়ে ফেলা কৃত্রিম জলাশয়ের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করলাম সেই একই পায়ের ছাপের অনুগমন পদ্ধতি—কখনই সদ্য খুঁড়ে ফেলা মাটিতে পায়ের ছাপ লক্ষ্য করা গেল না। বেশ কয়েকদিন কয়েক বার করে পর্যবেক্ষণ করে একই সিদ্ধান্তে এলাম যে সে পায়ের ছাপটি (পুরুষ বাঘের) সদ্য খোঁড়া মাটি ছোঁয়নি পর্যন্ত। তখন সে
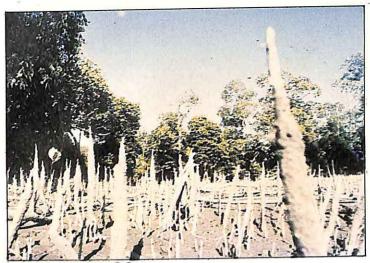
সুন্দরবনে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণকারী শিকড়
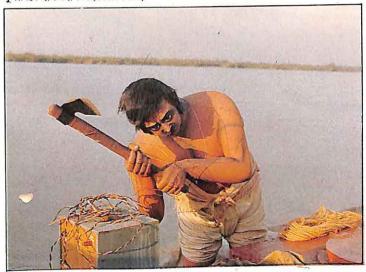
কৃত্রিম কাঠুরে ও বৈদ্যুতিক বাক্‌স সুন্দরবনে বাঘ ধরার এক প্রয়াস

পায়ের ছাপের সঙ্গে কয়েকদিন আগে কোন এক মৎস্যজীবীর হত্যাকারী বাঘের পায়ের ছাপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলাম যে একই পায়ের ছাপ। একই অভিজ্ঞতা হল মাতলা ও ছোটাহর্দী বনাঞ্চল থেকেও।

মাতলা, ছোটোহর্দী ও গোসাবা বনাঞ্চল ব্লকে আরও একটি প্রয়োজনীয় তথ্য নজরে এল যে মানুষখেকো বাঘ ব্যতিরেকে অন্যান্য বাঘ কিন্তু অতি স্বচ্ছন্দে সদ্য খুঁড়ে ফেলা মাটির উপর দিয়ে সহজেই যাতায়াত করেছে—পায়ের ছাপ থেকে সহজেই সেটা উপলব্ধি করলাম।

হঠাৎ মনে প্রশ্ন জাগল সুন্দরবন বাঘের স্বাভাবিক গতিসীমা কি ? কিন্তু এ প্রশ্নের সহজ উত্তর পাওয়া ব্যাঘ্রচরিত্রের মতই জটিল। একদিন এ প্রশ্নের কিছুটা সমাধান করতে পেরে কৃতার্থ হলাম। স্পীড-বোটে করে টহল দিচ্ছিলাম সুন্দরবন ব্যাঘ্রপ্রকল্প অঞ্চলের বাফার বনাঞ্চলের নবেকী খালে। নদীর পারে একটি বাঘকে লক্ষ্য করলাম—তখন বেলা বারোটা কি একটা হবে। কিন্তু কি আশচর্য, আমি স্পীড বোট নিয়ে খাল দিয়ে যাচ্ছি বাঘটিও আমাকে অনুসরণ করেই হয়ত জঙ্গলের পার দিয়ে তার স্বাভাবিক গতিতে চলেছে—যেখানে প্রথম বাঘটিকে লক্ষ্য করলাম সেখানে তার পায়ের ছাপ দেখে স্পীড বোটের মিটারে এক কিলোমিটার গিয়ে থেমে আবার তার পায়ের ছাপ নিলাম ও সময়টা হিসেব করে দেখলাম দশ মিনিটের মত। স্পীড বোটের গতিবেগ অনেক বেশী হওয়ায় এক কিলোমিটার দূরত্বে একটি কেওড়া গাছ লক্ষ্য করে চিহ্ন দিলাম ও সেটি কতক্ষণ পরে বাঘটি অতিক্রম করে তা দেখার জন্য কাছেই অপেক্ষা করলাম। দেখলাম দশ মিনিটের মত সময় লেগে গেল বাঘটির এক কিলোমিটার পথ অতিক্রম করার জন্য। আমি আমার নোট বুকে সময়টি লিখে রেখেছিলাম। বাঘ অবশ্য প্রয়োজনের খাতিরে তার গতিবেগেরও পরিবর্তন ঘটায়। শিকার করার সময় নাকি তার গতিবেগ চার গুণ বেড়ে যায়—কিন্তু এর সঠিক হিসেব না করতে পারলেও বেশ কয়েকবার বাঘের শিকার পদ্ধতি লক্ষ্য করে বুঝেছিলাম হয়ত কথাটা মিথ্যে নয়।

বাঘের ডাক সম্বন্ধেও নানা মুনির নানা মত। তবে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বৈজ্ঞানিক মতামত হচ্ছে যে বাঘের ডাক অনিয়মিত ও পরিস্থিতির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে ব্যাঘ্রানুসন্ধানে ঘুরেছি ও তাদের গলার আওয়াজও টেপ রেকর্ডারে ধরে রাখার চেষ্টা করেছি। দুটো আওয়াজ বাঘের ক্ষেত্রে খুব স্পষ্ট—একটি তাদের যৌন-মিলন সময়ে ও অন্যটি আহত অবস্থায়। তা ছাড়া অতি অনিয়মিত কিছু আওয়াজের কথা অনেক

প্রকৃতিবিজ্ঞানী উল্লেখ করেছেন—প্রকৃতিবিজ্ঞানী লেহাউসেন (১৯৫৬) ও ডেনিস (১৯৬৪) উল্লেখ করেছেন যে প্যান্থেরা গোষ্ঠীভুক্ত প্রাণীরা নাকি "পারিং" নামক গলার আওয়াজে অভ্যস্ত নয়, যদিও পাওয়েল (১৯৫৭) অভিমত প্রকাশ করেছেন যে এরূপ আওয়াজ উনি বাঘের ক্ষেত্রেই শুনেছেন। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জিলার জলদাপাড়া অভয়ারণ্যে আমি নিজেই এরূপ বাঘের ডাক শুনেছি। একবার একটি বাঘিনী তার তিনটি বাচ্চাকে নিয়ে খেলা করতে করতে একবার বাচ্চা তিনটি তার বুকের উপরে উঠে যায়—বাঘিনী মা তখন এরূপ আওয়াজ করেছিল বেশ কয়েকবার। কিন্তু সুন্দরবনে আমি এরূপ আওয়াজ কখনও শুনিনি। আর একটি আওয়াজ বাঘ কখনও কখনও করে থাকে যাকে ইংরেজীতে বলে "প্রুষ্টেন"—এ ধরনের আওয়াজ বাঘের নাসারন্ধ্র থেকে বেরোয় যখন দুটো বাঘ বন্ধুত্বের খাতিরে একে অপরে দিকে এগোতে থাকে—মধ্যপ্রদেশের কান্হা জাতীয় উদ্যানে আমি একবার এরূপ ধরনের আওয়াজ শুনেছি বলে মনে পড়ছে। এ ধরনের আওয়াজও কখনই সুন্দরবনে শুনেছি বলে মনে পরে না। এ আওয়াজটা অনেকটা দুটো গৃহপালিত বিড়ালরা একে অপরকে দেখে করে থাকে। সিংহ, জাগুয়ার বা লেপর্ডের ক্ষেত্রে অবশ্য এ ধরনের আওয়াজ কখনই শোনা যায় না। বাঘের ক্ষেত্রে "পুকিং" নামক আওয়াজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এরূপ আওয়াজ অনেকটা সম্বরের সাবধানী সম্বোধনের মতই। শিকারীদের কাছে এরূপ আওয়াজ অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর কারণ তারা এরূপ আওয়াজকে প্রায়শঃই সম্বরের আওয়াজ বলে ভুল করতে পারে। বাঘ নাকি এরূপ আওয়াজ করে সম্বর শিকারের প্রয়োজনেই। এ আওয়াজটা অত্যন্ত পরিষ্কার, উচ্চ স্বরের "পক্" আওয়াজেরই মত—একবার বা একাধিকবার। কিন্তু প্রকৃতিবিজ্ঞানী ব্র্যাণ্ডার (১৯২৩) ও চ্যাম্পিয়ন (১৯২৭) অবশ্য এ ধরনের "পুকিং" আওয়াজকে বাঘের যৌন-মিলন সঙ্কেত বলে অভিহিত করেন। এরূপ আওয়াজ নাকি বাঘেরা কখনও কখনও মলমূত্র ত্যাগ করার সময়ও করে থাকে। মানুষ দেখে বিব্রত হওয়ার আওয়াজও নাকি "পুকিং"-এরই মত—এরূপ অভিমতও প্রকাশ করেছেন অনেক প্রকৃতিবিজ্ঞানী। "গ্রাণ্টিং" নামে একটি বাঘের ডাক প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা অনুভব করেছেন কয়েকটি বিশেষ পরিস্থিতিতে। বাঘিনী এরূপ শব্দ করে থাকে তার বাচ্চাকে নির্দিষ্ট পথে অনুসরণের জন্য। আবার কেউ কেউ বলেন এরূপ শব্দ বাঘের বাচ্চাদের পক্ষেও করা অসম্ভব নয়। অন্য আর একটি আওয়াজ ব্যাঘ্র প্রজাতি করে থাকে যাকে বলে "মিয়াও"—অনেকটা বিড়ালের "মেও"-এর মত। এরূপ আওয়াজ

সাধারণতঃ বাচ্চারাই করে থাকে কোন নতুন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য বা বাচ্চারা যখন মা পরিত্যক্ত হয়। "ওফ" এবং "রোর"—এ দুটো আওয়াজ ব্যাঘ্র প্রজাতিদের স্বাভাবিক আওয়াজ বলেই কথিত। "ওফ" আওয়াজটি খানিকটা বিরক্তি উৎপাদনের স্বাক্ষর বহন করে কিন্তু "রোর" আওয়াজটি বাঘের স্বাভাবিক গমনাগমনের সময় নির্গত হয়। সুন্দরবনে যে আওয়াজটি খুব স্বাভাবিকভাবেই শ্রুত হয় সেটি হচ্ছে এ "রোর" আওয়াজ। আমি উত্তরপ্রদেশের করবেট জাতীয় উদ্যানে এ "রোর" আওয়াজ শুনেছি। তাছাড়া বন্দী অবস্থায় বহুবার চিড়িয়াখানাতেও "রোর" আওয়াজ শুনেছি। চ্যাম্পিয়ন (১৯২) উল্লেখ করেছেন বাঘ তার স্বাভাবিক শিকার প্রাণী পাওয়ার পরও কখনও কখনও এরূপ "রোর" আওয়াজ করে থাকে। রাশিয়ার প্রকৃতি বিজ্ঞানী বৈকভ (১৯৩৬) ও অগনেভ (১৯৬২) উল্লেখ করেছেন যে মাঞ্চুরিয়াতে বাঘের "রোর" তারা শুনেছেন শীতকালে যৌনমিলনের পরবর্তী সময়ে। সুন্দরবনে অবশ্য শীতকালে বাঘের আওয়াজ খুব কমই শোনা যায়—আমার দীর্ঘ দশ বছরের অভিজ্ঞতায় আমি একবার মাত্র শীতকালে বাঘের "রোর" শুনেছি কিন্তু অন্যান্য সময়ে অর্থাৎ প্রাক্-বর্ষা থেকে শীতের পূর্ব পর্যন্তই বেশীর ভাগ "রোর" শুনেছি। বাঘের এ "রোর" আওয়াজ সুন্দরবনের ক্ষেত্রে যৌনমিলনের সময়কেই সূচিত করে বলে মনে হয়। বাঘ প্রজাতির ক্ষেত্রে যৌনমিলনের সময়-সূচী নিয়েও প্রচুর মতভেদ প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের মধ্যে রয়েছে। প্রকৃতিবিজ্ঞানী বাউডী চিড়িয়াখানায় আবদ্ধ বাঘ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে বাঘ-বাঘিনীর যৌন মিলন কোন একদিনে সতেরো বার পর্যন্ত হয়ে থাকে—যদিও কোনও মিলন-পর্বই পনেরো থেকে কুড়ি সেকেণ্ডের বেশী স্থায়ী হয় না। প্রাকৃতিক পরিবেশে অবশ্য এত বেশি সংখ্যক মিলনপর্ব অবিশ্বাস্য,তবে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী চারবার কোনও দিনে লক্ষ্য করা গেছে। মিলন পর্বের সময় অবশ্য তিরিশ সেকেণ্ড থেকে এক মিনিটের মধ্যেই হয়ে থাকে। সুন্দরবনের বাঘ প্রজাতির ক্ষেত্রে "রোর" আওয়াজ বাঘিনীরা করে থাকে তার বাচ্চাদের আকৃষ্ট করার জন্যও। কারণ বেশ কয়েকবার সুন্দরবনে গোনা, ছোটহদী প্রভৃতি অঞ্চলে দেখা গেছে যে বাচ্চা ব্যাঘ্র শাবক বাঘিনীর আওয়াজ পাওয়ার পরই বাঘিনীকে অনুসরণ করছে। এ সকল ছাড়া আর যে আওয়াজ বাঘের ক্ষেত্রে শোনা যায় সেগুলির ইংরেজী তর্জমা হল growling, snarling and hissing. এ সমস্ত আওয়াজই করা হয় ভীতি বা বিরক্তি প্রদর্শনের নমুনা হিসেবে। মানুষ দেখেও কখনও কখনও এ ধরনের আওয়াজ করতে শোনা যায়,বিশেষতঃ সুন্দরবনের ক্ষেত্রে। আক্রমণে

উদ্যত বাঘ-বাঘিনীকে কখনও কখনও "Coughing roar" বা একবার কাঁশি মিশ্রিত গর্জন করতে শোনা গেছে। কোন বিশেষ শিকারী প্রাণী নিয়ে যদি একাধিক বাঘ বা বাঘিনী বা একাধিক শিকার প্রাণী যথা বাঘ-লেপার্ড ইত্যাদি যুদ্ধরত হয় তবে এ ধরনের আওয়াজ শোনা যায়। মধ্যপ্রদেশের কান্হা জাতীয় উদ্যানে, উড়িষ্যায় সিমলিপালে ও উত্তরপ্রদেশের করবেট জাতীয় উদ্যানে এরূপ আওয়াজের বহু উদাহরণ পাওয়া গেছে। একবার সুন্দরবন ব্যাঘ্রপ্রকল্প অঞ্চলে আমি নিজেই এরূপ আওয়াজ স্বকর্ণে শুনেছি। সেটা ছিল অক্টোবর মাসের সকাল। আমি বাঘমারা ব্লকের মেছুয়া খালের পার্শ্ববর্তী ঝাউবনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সমুদ্রের ঢেউ মাটি ও বালিকে এমনভাবে retaining wall-এর মত করেছে যে প্রাচীরের ওপারে কি আছে দেখাই যায় না। আমি প্রাচীরের পাশ দিয়ে চলেছি নীচের দিকে লক্ষ্য রেখে অর্থাৎ বাঘের কোনও সদ্য পায়ের ছাপ দেখা যায় কিনা সেটাই আমার লক্ষ্য ছিল। হঠাৎ কি মনে করে প্রাচীরের উপরে উঠলাম ও একটি বাঘকে প্রাচীরের ঠিক নিচের দিকে বসে থাকতে দেখে খানিকটা আঁতকে উঠলাম। বাঘটিও বোধহয় খানিকটা বিস্ময়াবিষ্ট ও বিরক্তও বটে। সকালবেলা তার সাম্রাজ্যে এরূপ অনধিকার প্রবেশের জন্য। দু-এক সেকেণ্ড ঠিক কি করব বুঝতে পারছিলাম না। বাঘটি তখন দুবার "Coughing roar"এর মত আওয়াজ করেছিল আমার বেশ মনে আছে ও তারপরেই পশ্চাদ্ধাবন ম্যানগ্রোভ জঙ্গলের দিকে। আমার ইচ্ছে ছিল বাঘটির পায়ের ছাপ plaster cast করার কিন্তু সঙ্গী বনবিহারী বাদ সাধল। কিছুতেই আমাকে এগোতে দিল না ও লঞ্চে নিয়ে চলে গেল।

ব্যাঘ্র প্রজাতির বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে আদান প্রদানের সবচেয়ে বড় নিদর্শন মেলে তাদের একে অন্যকে সম্ভাষণের মাধ্যমে। বাঘ এরূপ সম্ভাষণ অন্যর ক্ষেত্রে প্রকাশ করে তার মুখ, নাক ও শরীরের অন্যান্য অংশ অন্যের দেহের উপরে ঘষে ফেলার মধ্য দিয়ে। এরূপ করতে গিয়ে দেখা যায় যে বাঘের লেজটি কখনও কখনও সোজা উপরের দিকে উঠে যায় শরীরের সঙ্গে সমকোণ তৈরী করে। বিশেষতঃ বাচ্চারা তার মায়ের শরীরের সঙ্গে তাদের নাক, মুখ ও শরীরের অন্যান্য অংশ ঘষে ফেলে। বাঘের প্রাক্-যৌন কর্মকাণ্ডও অনেকটা এভাবেই ঘটে থাকে। পুরুষ বাঘ তার মুখ, নাক ও শরীরের অন্যান্য অংশ বাঘিনীর অন্যান্য অংশে ঘষে দেয় ও বেশ কয়েকবার এরূপ সোহাগলীলা চলতে থাকে যৌন ক্রিয়াকাণ্ডের পূর্বে।

বাঘের আক্রমণাত্মক প্রক্রিয়াও বহু সময়েই শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন

থেকে বোঝা যায়। নাক ও কপাল সঙ্কোচন ও কান দুটোর পশ্চাৎ অপসরণ এরূপ আক্রমণাত্মক প্রক্রিয়ারই প্রাথমিক লক্ষণ। তার পরের প্রক্রিয়া হচ্ছে মুখ খুলে দাঁত বের করা ও কান দুটোর প্রসারণ ও এরই সঙ্গে growling ও snarling লেজের মৃদু সঞ্চালন থেকে উপর-নীচ আন্দোলন আক্রমণাত্মক প্রক্রিয়ারই অভিব্যক্তি। লেহাউসেন (১৯৬০) অবশ্য ব্যাঘ্র প্রজাতির মধ্যে আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষামূলক ভীতি প্রদর্শনে তাদের মুখ ও শরীরের তুলনামূলক পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছেন। আক্রমণাত্মক ভীতি প্রদর্শনে মুখটা বন্ধ রেখে কানটা খাড়া থাকে অথচ আত্মরক্ষামূলক ভীতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে দাঁত বের করে রাখে ও কানটা খানিকটা আল্‌গা থাকে। কিন্তু এরূপ বর্ণনা বাঘেদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বন্য পরিবেশে দেখা যায় বলে মনে হয় না অবশ্য চিড়িয়াখানার বন্দীজীবনে এরূপ শারীরিক পরিবর্তন চোখে পড়ে। তবে এটা ঠিক যে আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে কানের উপরকার সাদা অংশ প্রতীয়মান হয় বন্য পরিবেশেও। এরূপ শারীরিক ভঙ্গী বেশ কয়েকবার সুন্দরবন জঙ্গলে, সিমলিপাল ব্যাঘ্র প্রকল্প অঞ্চলে ও করবেট জাতীয় উদ্যানেও প্রত্যক্ষ করেছি।

একবারের একটা ঘটনার কথা মনে এসে যাচ্ছে। দুই বাঘিনী ও তাদের দুই বাচ্চা কোনও একটি বুনো শুয়োর শিকার করে আহারে ব্যস্ত। ঘটনাটি সুন্দরবনের বাগমারা বনের কোন এক দ্বীপে। আমি মোটর লঞ্চে করে ডিঙ্গী করে সে দ্বীপের দিকেই যাচ্ছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল বাঘের সংখ্যা নিরূপন করা সে দ্বীপের। যেতে যেতে জঙ্গলের পারে বাইনোকুলার দিয়ে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে হল জঙ্গলের ধারে বিভিন্ন মাপের পায়ের দাগ। কৌতূহলী হলাম। সঙ্গে সঙ্গে ডিঙ্গি থেকে জঙ্গলের ধারে নেমে পড়লাম। একটি বাঘিনী ও বাচ্চার পায়ের দাগ লক্ষ্য করলাম। খানিকদূর যেতে না যেতেই আরও পায়ের দাগ লক্ষ্য করলাম—কিন্তু দাগগুলো এমনভাবে মাটি ও বালিতে মিশে আছে যে আমার পক্ষে সাধারণ ভাবে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল যে পায়ের দাগগুলো আলাদা বাঘিনী ও বাচ্চার—যদিও সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। এভাবে জঙ্গলের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে প্রায় আধ ঘণ্টা চলেছি—হঠাৎ জঙ্গলের ধার ঘেষে একটা কি রকম শন্‌শন্‌ আওয়াজ। আওয়াজ যেন মনে হচ্ছে একটা উঁচু বালির ঢিপির নীচের দিক থেকেই আসছে—সঠিক বুঝতে না পেরে একেবারে বালির উঁচু ঢিপির উপরেই উঠে পড়লাম ঘটনাটা ভাল ভাবে বোঝার জন্য। যা দেখলাম তা বোধহয় আমার সারা জীবনের এক স্মরণীয় দৃশ্য হয়ে থাকবে। ঘটনার সময়টা ছিল বিকেলবেলা—সন্ধ্যে হয় হয়। তাই লঞ্চ থেকে বেরোনোর সময় ক্যামেরা নিয়ে

নামার কথা ভাবিনি। আমি দেখি দুই বাঘিনী ও তাদের দুই বাচ্চা ও একটি আধ খাওয়া শুয়োর। বাঘিনীদ্বয় শুয়োরের পেছনের অংশ খেয়ে শেষ করছে ও বাচ্চা দুটো শিকারের সামনের দিকে ও বাঘিনীদ্বয়ের আশেপাশে ঘুরছে। ভোজনরতা বাঘিনীদ্বয় মুখ দিয়ে অনবরত আওয়াজ করে চলেছে—কখনও আস্তে কখনও খানিকটা জোরে জোরে। এ ভাবে পাঁচ-ছ মিনিট চলল—তারপরে দেখলাম দু বাঘিনীই খানিকটা ঘড় ঘড় আওয়াজ করতে করতে যেরকম বেড়ালরা করে থাকে, শিকার বস্তু থেকে দশ-বারো গজ দূরে গিয়ে বসে পড়ল কিন্তু তাদের বসার ভঙ্গী একে অপরের মুখোমুখী। খানিকবাদে—বোধহয় মিনিট দশেক হবে একটি বাঘিনী হঠাৎ সেখান থেকে উঠে অর্ধেক খাওয়া শুয়োরের কাছে এল। আমি লক্ষ্য করলাম যে বাঘিনীর দুটো কানই পেছনের দিকে ভাঁজ করা ও মুখ হাঁ করা। অন্য বাঘিনী তখন তার দাঁত বের করে আস্তে আস্তে আওয়াজ করছে। একটি বাচ্চা যখন শুয়োরের কাছে আসা বাঘিনীর পাশে এল, হঠাৎ বাঘিনীটি বাচ্চাটিকে থাবা দিয়ে সরিয়ে দিল। এর পরে বাঘিনীটি শুয়োরের সামনের অংশ খানিকটা খেতে শুরু করল ও কিছুটা মাংস নিয়ে সরে গেল আগের জায়গার কাছাকাছি ও অন্য বাঘিনীটি তখন আবার শুয়োরের কাছে এসে খানিকটা মাংস দাঁতে করে নিয়ে সরে গেল। এ বাঘিনীটিরও শুয়োরের কাছে আসার সময় কানের পেছনের দিকের ভাঁজ লক্ষ্য করলাম ও মৃদু মৃদু আওয়াজও শুনতে পেলাম। এ ভাবে প্রায় আধ ঘণ্টা চলল—আমি আমার নোটবুকে যতটা পারা যায় লিখে চলেছি ও প্রাণভরে এ অপরূপ দৃশ্য দেখে চলেছি। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম একটি বাঘিনী বনের একদিকে ও অন্য বাঘিনীটি বনের অন্য দিকে চলে গেল ও বাচ্চা দুটোও আস্তে আস্তে নজরের আড়ালে বনের ভেতরে চলে গেল। আমি আর এগোলাম না—কারণ অন্ধকার সুন্দরবন আঁকড়ে ধরছে আস্তে আস্তে। সে রাতে মোটরলঞ্চে ঐখানেই থেকে গেলাম।

পরদিন ভোর হতে না হতেই আবার অর্ধেক খাওয়া শুয়োরের অবস্থা দেখতে গেলাম। এবার কিন্তু অন্য দৃশ্য। দেখলাম একটি বাচ্চা বাঘ সেই অর্ধেক খাওয়া শুয়োরের পাশে রয়েছে। বাচ্চা বাঘটিও খানিকটা ঘড় ঘড় আওয়াজ করছে। ইতিমধ্যে দু-তিনটি শকুনের আবির্ভাব। পাশের গেওয়া গাছে শকুন তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খাওয়ারের দিকে তাকিয়ে আছে ও বাচ্চা বাঘটির জন্য ধারে আসছে না। বাঘের বাচ্চাটি যখন খানিকটা দূরে চলে আসছে শকুনটি খাওয়ারের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছে। একবার তো এমন হল যে বাচ্চা বাঘটি শুয়োরের কাছে এসে যাওয়া শকুনকে তাড়া করল ঘন ঘন কাশির মত আওয়াজ করতে করতে।

শকুনটি তখন গাছে আশ্রয় নিল।

বাঘের সম্বোধন করার ভঙ্গীও অভিনব। কোনও বাঘ তার বাচ্চা আদর করার জন্য নাক, মুখ ও শরীরের অন্যান্য অংশ বাচ্চাটির অন্যান্য অংশের সঙ্গে ঘষে দেয় যথেচ্ছভাবে। কখনও কখনও আবার সম্ভাষণ পদ্ধতি স্বল্পও হয় অর্থাৎ চিবুকে চিবুকে স্পর্শ—কিন্তু আদর করতে গিয়ে দেখা যায় যে তাদের লেজটি কিন্তু শরীরের সঙ্গে সমকোণ তৈরী করে উপরের দিকে ওঠানো। বিশেষতঃ বাচ্চা বাঘরা তাদের মায়েদের এ ভাবেই আদর ও সম্ভাষণ করে থাকে মা যখন স্বল্প অনুপস্থিতির পর বাচ্চাদের কাছে ফিরে আসে। কোনও খাদ্য প্রাণীর অনুসন্ধানে মাকে অনুসরণ করতে গিয়েও বাচ্চাদের এরূপ সম্ভাষণ পদ্ধতি লক্ষ্য করেছি সুন্দরবন জঙ্গলে। কিন্তু পূর্ণবয়স্ক পুরুষ বাঘদের একত্রে কখনই এরকম সম্ভাষণ নজরে আসেনি সুন্দরবন অঞ্চলে—যদিও বাঘ ও বাঘিনীর যৌন মিলনের পূর্বে এরূপ সম্ভাষণ নজরে এসেছে কখনও কখনও।

ব্যাঘ্র প্রকল্প

১৯৭৩ সালের ১লা এপ্রিল সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে ন'টি বনাঞ্চলে যে ব্যাঘ্র প্রকল্প শুরু হয়েছিল পশ্চিমবাংলার সুন্দরবন তার একটি। যদিও সুন্দরবন প্রকল্পের কাজ শুরু হতে নানা কারণে বেশ কিছু সময় দেরী হয়েছিল। কিন্তু ব্যাঘ্র প্রকল্প কি ও কেনই বা এর প্রয়োজন হল ? অনেকে মনে করেন ব্যাঘ্র প্রকল্প হচ্ছে যে কোনও উপায়ে বাঘের সংখ্যা বাড়ানো কারণ বাঘের সংখ্যা ভীষণ রকমভাবে কমে যাচ্ছিল। এরূপ ধারণা ঠিক নয়। ব্যাঘ্র প্রকল্প যে কোনও উপায়ে শুধুমাত্র বাঘের সংখ্যা বাড়ানো নয়—ব্যাঘ্র প্রকল্প প্রকৃতি সংরক্ষণেরই প্রকল্প।

জীববিজ্ঞানরূপী পিরামিডের শীর্ষবিন্দুতে রয়েছে এ বাঘ। তাই এ প্রাণী যে সকল প্রাণীকুলের ওপর নির্ভর করে আছে তাদের সুষ্ঠু সংরক্ষণ অর্থাৎ গাছপালা ও প্রাণীজগৎ নিয়ে সৃষ্ট এ বিরাট ও জটিল সুশৃঙ্খল প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার মধ্যেই ব্যাঘ্র প্রকল্পের সাফল্য নির্ভর করছে। মানুষের সীমাহীন অবহেলা ও অবিবেচনার ফলে এক সময় চরম মূল্য দিতে হয়েছিল যখন জাভা দেশীয় গণ্ডার ও বুনো মোষ সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে শেষ হয়েছিল। সুন্দরবনের বাঘকে যাতে সে অবহেলার বলি হতে না হয় তারই জন্য এ ব্যাঘ্র প্রকল্প। প্রকৃতিতে একটি প্রাণী অন্যটির উপর নির্ভরশীল ও অন্য প্রাণী উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে—একে অন্যের পরিপূরক, এ ভাবেই তো গড়ে উঠেছে প্রকৃতির শৃঙ্খলা যাতে প্রতিটি প্রাণীর ও উদ্ভিদের নিজস্ব কর্তব্য কর্ম পালন করতে হয়। কোনও একটি প্রাণীর বা উদ্ভিদের কর্তব্য কর্মে সামান্যতম ত্রুটিও প্রকৃতির ভারসাম্য ভীষণভাবে নষ্ট করে। ব্যাঘ্র প্রকল্প ভারতবর্ষে শুরু হওয়ার আগে বাঘের মোট সংখ্যা বিপজ্জনকভাবে কমে এসেছিল। আনুমানিক আঠেরো শতর মতো—বাঘের সংখ্যার এ মাত্রাতিরিক্ত কম হওয়া প্রাকৃতিক ভারসাম্যের অভাব

চিহ্নিত করেছিল। তাই বাঘের সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রকৃতি সংরক্ষণেই হাত দিয়েছিল মানুষ।

মানুষ একদিন বাঘ ও তার শিকার প্রাণীকে হত্যা করে যে ক্ষমাহীন ভুলের নজির সৃষ্টি করেছিল আজ ব্যাঘ্র প্রকল্প তৈরী করে নিজের ভুলেরই খেসারত দিচ্ছে প্রকৃতির রক্ষা প্রকল্পের মধ্যে। প্রকল্প শুরু হওয়ার আগে সুন্দরবনের এক পঞ্চমাংশ বনাঞ্চলে বাঘের সংখ্যা সমীক্ষা করা হয়েছিল। কেবলমাত্র সাতাশটি বাঘের উপস্থিতির নজির মিলেছিল।

সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প অঞ্চলে কাজ শুরু করতে হয়েছিল বহু প্রতিকূল পরিস্থিতিতে। যদিও প্রকল্পের পরিকল্পনার নথিতে পরিষ্কারভাবে বলা ছিল ব্যাঘ্র প্রকল্পের "কোর" অঞ্চলে কোনও কাঠ কাটা, মধু সংগ্রহ করা বা অন্য কোন বাণিজ্যিক কাজকর্ম চলবে না তথাপি প্রকল্প শুরু হওয়ার প্রথমদিকে সে সমস্তই সমানভাবে চলছিল। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের দ্বিতীয় অধিকর্তা হিসাবে তাই এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। সাধারণ মানুষকে প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও সচেতন করে তোলার কাজও সমানভাবে চালাচ্ছিলাম। বে-আইনী কাঠ কাটা বন্ধ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন্যপ্রাণী উপদেষ্টা পর্ষদের আলোচনাতেও প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেছিলাম—যাই হোক সেসব বন্ধ হল। তারপরে উল্লেখযোগ্য যে কাজটাতে হাত দেওয়া হল সেটি হচ্ছে বাঘ ও অন্যান্য শিকার প্রাণীর জন্য মিষ্টি জলের যোগান দেওয়া বিভিন্ন বনাঞ্চলে কারণ সুন্দরবনের নদী নালার জল লবণাক্ত ও সে লবণাক্ততা দিন দিন বেড়েই চলেছে। সে সকল কৃত্রিম জলাশয়ের কাছে নজরমীনার তৈরী করাও শুরু হল যাতে বাঘ ও অন্যান্য শিকার প্রাণীর ওপরে গবেষণার সুযোগ হয়। এ ছাড়া টহলদারীর ব্যবস্থাও জোরদার করা হল—যাতে যে কোনও বে-আইনী অনুপ্রবেশকারীদের কাজকর্ম বন্ধ করা যায়। এ সকল বে-আইনী কাজকর্মের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে কিন্তু আমি নিঃসংকোচে বলছি যে সুন্দরবনের সাধারণ মানুষের অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি যা আমি কখনও ভুলবো না। তবে এ সঙ্গে এটাও বলতে বাধ্য হচ্ছি বহু স্বার্থান্বেষী মানুষের সঙ্গে আমার সংঘাত শুরু হয়েছিল। কিন্তু সুন্দরবনের সাধারণ মানুষের সাহায্যে সব বাধাই আস্তে আস্তে দূর হতে লাগল। সুন্দরবনে একটি সমস্যা হলো যে সমস্ত বনাঞ্চলেই যথেষ্ট সংখ্যক বাঘের শিকার প্রাণী নেই—তাই কৃত্রিমভাবে শুয়োর প্রজনন কেন্দ্র তৈরি করার কাজে হাত দিলাম যাতে সে সকল শুয়োর বাঘের খাদ্য হিসাবে বিভিন্ন বনাঞ্চলে সরবরাহ করা যায়।

তবে সুন্দরবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল 'মানুষখেকো বাঘ'—যার ফলে মানুষ ও বাঘের মধ্যে সম্পর্কে চিড় ধরতে বাধ্য। সরকারী হিসেব মতো বাঘের আক্রমণে প্রতি বছর প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ জনের মত মানুষের মৃত্যু ঘটে। বেসরকারী হিসেব এর থেকেই অনেক বেশী। সুন্দরবনের বাউলে (কাঠুরে), মউলী (মধু সংগ্রহকারী) নৌকো নিয়ে মানুষখেকো বাঘের বনাঞ্চলে যায় বা যেতে বাধ্য হয়, এর ফলেই এত মানুষের মৃত্যু। এ মানুষগুলির দারিদ্র্য এতই প্রবল ও অন্য কোন বিকল্প জীবিকা না থাকার জন্যই এরা জঙ্গলে যেতে বাধ্য হয় নিজের ও পরিবারের ক্ষুধা নিবারণের তাগিদে, মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও। এদের না আছে নিজেদের আত্মরক্ষার কোন ব্যবস্থা, না আছে জঙ্গলে-নদীতে বাস করার জন্য কোনও নিরাপদ আশ্রয়। কাজের শেষে তাই এরা প্রতিদিন কার্যতঃ খোলা ডিঙ্গিতেই রাত কাটায়—এভাবেই তাদের প্রতিদিনের দিন যাপনের গ্লানি সহ্য করতে হয়। সুযোগসন্ধানী মানুষখেকো বাঘও মানুষের জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত—তাই রাতে এ সকল খোলা ডিঙ্গিতে উঠে অনায়াসেই মানুষকে নিয়ে সাঁতার কেটে চলে যায়। প্রতি বছরই এ ধরনের ঘটনা বেশ কয়েকটি ঘটে থাকে। সরকারের তরফে মাঝে মাঝে বোমা পটকা এ-সকল দরিদ্র মানুষকে দেওয়া হয় বটে কিন্তু এতে তাদের আত্মরক্ষার কাজে খুব যে সাহায্য হয় মনে হয় না। প্রতিটি নৌকার শক্ত দরজা ও পাটাতন তৈরী করানোর ব্যাপারটা অত্যন্ত প্রয়োজন বলে মনে করি। কিন্তু অন্য দিকে যখন দেখি সরকার ব্যাটারী চালিত মাটির মানুষের মডেল ও বৈদ্যুতিক তার দিয়ে সুন্দরবন মানুষখেকোকে নিরস্ত করার চেষ্টা করে তখন মনে হয় ইংরেজীতে priority বা বেশী গুরুত্বপূর্ণ শব্দটার আরও বেশী প্রয়োগের অভাব বহু স্থানেই রয়েছে। সুন্দরবনের নদী নালা শূলোর বনাঞ্চলে যে সকল গরীব মানুষ তাদের পরিবারের অন্ন সংস্থানের জন্য যায় তারাও আমাদেরই ভাই ও আত্মীয়। তাই ব্যাঘ্র প্রকল্পের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করছে এ সকল মানুষের নিরাপত্তার সুব্যবস্থা করার মধ্যে এ সত্যটা ভুলে গেলে প্রকল্পের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। সুন্দরবনের বনাঞ্চল থেকে কিছু অল্প বয়সের বা অতি বৃদ্ধ বয়সের বা অন্য কোন বয়সের বাঘ নানা কারণে লোকালয়ে এসে মানুষের গরু, মোষ মারে ও এমনকি মানুষকেও আক্রমণ করে। এ ধরনের ঘটনায় প্রকল্প কর্মীদের ধৈর্য ও বিচারবোধ অত্যন্ত প্রয়োজন কারণ ক্ষতিগ্রস্থ মানুষেরা স্বাভাবিক কারণেই তখন উত্তেজিত থাকেন। স্বাভাবিকভাবে তাড়ানো না গেলে বাঘকে সঠিক ওষুধ ব্যবহার করে ঘুম পাড়াতে হয়। হ্যাঁ, সত্যি সত্যিই সুন্দরবনের বাঘকে একবার আমরা সকলে মিলে ঘুম

পাড়িয়েছিলাম। এটা কিন্তু নিছক ছেলে ভুলানো গল্প নয়। সত্য ঘটনা।

১৯৭৪ সালে একবার সুন্দরবনে এরকম প্রথম চেষ্টা হয়েছিল বাঘকে ঘুম পাড়াবার। সেবার একজন বিদেশী সাহেব এসেছিলেন বাঘকে ঘুম পাড়াতে সুন্দরবনে। বাঘকে কিন্তু ঘুম পাড়ানও হয়েছিল কিন্তু সেবার সাত দিনের মধ্যেই বাঘটির মৃতদেহ জঙ্গলে পাওয়া গিয়েছিল। সে ঘটনাটি নিয়ে খবরের কাগজে, রেডিওতে ও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় কি উৎসাহ সকলের। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা বাঘটিকে কিন্তু বাঁচান গেল না। এই কয়েকদিন আগেও সুন্দরবনের বাঘকে ঘুম পাড়ান হয়েছিল কিন্তু পত্রিকার সংবাদ থেকেই জানা গেল বাঘটি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মারা যায়। ঘটনাটি সে বছরের জানুয়ারী মাসের গোড়ার দিকেই ঘটেছিল। প্রথম ঘটনাটি ঘটে যখন একটি কম বয়সের পুরুষ বাঘ 'সুন্দর' যার নাম দেওয়া হয়েছিল, সুন্দরবন জঙ্গল থেকে ঝড়খালি বলে একটি গ্রামে আসে ও এক বৃদ্ধা মহিলা ও কয়েকটি গরু মারে। তখন কোন এক বিদেশী প্রকৃতিবিদ্‌কে ডাকা হয়েছিল বাঘটিকে ঘুম পাড়ানর জন্য। ঘুমও পাড়ান হল বহু চেষ্টার পর প্রায় ২৪ দিন পরে। কিন্তু ঘুমন্ত বাঘটির মৃতদেহ পাওয়া যায় সুন্দরবন জঙ্গলের গোসাবা নামক স্থানে যেখানে বাঘটিকে খাঁচা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল তার থেকে কেবলমাত্র সত্তর ফুট দূরে।

তারপরে বেশ কয়েক বছর গেল। হঠাৎ কোন এক বর্ষাকালে সুন্দরবন জঙ্গলের পীরখালী নামক জঙ্গল থেকে ভোররাতে আবার একটি কম বয়সের পুরুষ বাঘ পীরখালী নদী সাঁতরে দয়াপুর বলে গ্রামে আসে। একটি গরুকে মারে ও দয়াপুর গ্রামের রাইচরণ মিস্ত্রী বলে এক গ্রামবাসীর কুঁড়ে ঘরে ঢুকে পরে হঠাৎ। রাইচরণবাবু কিছু বুঝতে না পেরে কুটীরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দেন বাঘটিকে ঘরে বন্দী রেখে। সমস্ত দয়াপুর গ্রাম ও আশেপাশের প্রায় তখন যেন রাইচরণবাবুর কুটীরের কাছে ভেঙে পড়েছে। কি উত্তেজনা—বাঘ রাইচরণবাবুর ঘরে বন্দী। লোকের মুখে মুখে খবরটা পৌঁছে যায় সজনেখালী ব্যাঘ্র প্রকল্প অফিসে। আমি তখন সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের অধিকর্তা। আমি সে সময় মোটর লঞ্চে করে ব্যাঘ্র প্রকল্পের দূরবর্তী বনাঞ্চলে টহল দিচ্ছি। খবরটা রেডিও টেলিফোনে পেয়েই ঘুম পাড়ানী বন্দুক নিয়ে হাজির হতে বললাম বাঘটিকে ঘুম পাড়ানোর জন্য। রেডিও টেলিফোনেই প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলাম কি ঔষধ ব্যবহার করতে হবে ও কিভাবে ব্যবহার করতে হবে। আমার নির্দেশমত ঠিক ঠিকভাবে ঘুম পাড়ানোর কাজ হচ্ছে কিনা সেটা জানার জন্য রেডিও টেলিফোন খোলা রাখলাম সারাক্ষণ ও ঘটনাস্থলে নিজেই রওনা হয়ে

গেলাম। 'কেঠাসেট' বলে একরকমের ঘুমপাড়ানি ওষুধ ব্যবহার করার নির্দেশ দিলাম দুটো আলাদা মাপে—প্রথমবার দশ সি·সি· ও ঠিক সাত মিনিট বাদে আর ৫ সি·সি· ওষুধ ব্যবহার করা হল। প্রথমটা বন্দুক দিয়ে ও দ্বিতীয়বার পিস্তল দিয়ে। গুলির মধ্যে ঐ ওষুধগুলি ভরে দেওয়া হয় সিরিঞ্জের সাহায্যে। মিনিট পনেরোর মধ্যেই কিন্তু প্রবল পরাক্রান্ত বাঘটি ঘুমে অচেতন। তখন বাঘটির শ্বাসমাত্রা ও দেহের তাপ মেপে নেওয়া হল হাত দিয়ে। বাঘটির শ্বাস নেওয়ার মাত্রা ছিল প্রতি মিনিটে তেরোবার ও দেহের তাপমাত্রা হাত দিয়ে স্বাভাবিক বলেই মনে হল। বাঘটিকে এবার তো খাঁচায় বন্দী করতে হয়। ডিঙ্গিতে খাঁচাও তৈরী করে রাখা হয়েছিল আগে থেকেই। ডিঙ্গিটাকে ছোট মনে হওয়ায় একটি বড় নৌকো জোগাড় করা হল ও খাঁচাটি তাতে স্থানান্তর করা হোল। বাঘটিকে আধ ঘণ্টার মধ্যে চারজন লোক কাঁধে করে তুলে নিল ও খাঁচায় নিয়ে আসা হল। রাইচরণবাবুর কুঁড়েঘর থেকে খাঁচায় নিয়ে আসা এক অমূল্য অভিজ্ঞতা—কি প্রচণ্ড উত্তেজনা, লোকের বুক দুরুদুরু, বাঘটির ঘুম ভেঙে যাবে না তো এখনি। ঘুম ভেঙে গেলে তো মহামারি কাণ্ড। কে আগে পালাবে তাই নিয়েই প্রতিযোগিতা চলবে তখন। আমার এখনও মনে আছে আমাদের একজন লঞ্চের কর্মীর কি উত্তেজনা—একবার বাঘের মুখে হাত দেয়, একবার বুকে, একবার পায়ে—সব জায়গায় হাত বুলিয়ে দেখে পরীক্ষা করে নেয় বাঘটি আবার সব বুঝে ঘাপটি মেরে আছে না তো ? বলা বাহুল্য আমারও উত্তেজনা তখন তুঙ্গে অন্য সকলের সঙ্গে। তবে উত্তেজনার সঙ্গে দায়িত্বের কথাও চিন্তা করছি—জলজ্যান্ত বাঘ নিয়ে ব্যাপার তো। যাই হোক, রাইচরণবাবুর কুটির থেকে বাঘকে তো খাঁচায় তোলা হল—এবার কি হবে। বাঘটিকে কি আগের বারের মত জঙ্গলেই ছেড়ে দেওয়া হবে। জঙ্গলে ছাড়ার ব্যাপারে সাধারণ মানুষের ঘোর আপত্তি—বাঘকে কিছুতেই জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া যাবে না। অবশেষে ঠিক করা হল আলিপুর চিড়িয়াখানায় পাঠান হবে। লোকেরা বেজায় খুশী। এবার বাঘ সমেত নৌকো আমার লঞ্চে টেনে নিয়ে এলাম ক্যানিং-এ।

বাঘটির কখন জ্ঞান আসে সেটা জানার প্রচুর কৌতূহল ছিল—আমি তো খাঁচার পাশেই বসে আছি নোটবুক হাতে নিয়ে ও একজন পশু চিকিৎসক নিয়ে। পশু চিকিৎসকের কি বিপুল উৎসাহ বাঘটিকে সামনে দেখে—সারা জীবন গরু, মোষ দেখে দেখে ভদ্রলোক যে কখনও জলজ্যান্ত বাঘের চিকিৎসায় সাহায্য করতে পারবেন তা বোধহয় জীবনেও কখনও ভাবেননি। ঘুম পাড়ানোর চার ঘণ্টা পরে লক্ষ্য করলাম যে বাঘটির কান ও মুখের চারপাশ সামান্য সামান্য

নড়ছে। যাই হোক বাঘটির বোধহয় সামান্য জ্ঞান ফিরে আসছে বলে মনে হল। কিন্তু আমাদের তো আরও প্রায় ঘণ্টা চারেক মোটর লঞ্চে করে যেতে হবে ক্যানিং-এ যেখানে ট্রাক তৈরি সুন্দরবন বাঘকে অভ্যর্থনা করার জন্য। চার ঘণ্টা বাদে ক্যানিংয়ে পৌঁছে দেখি লোকে লোকারণ্য। কেবল ক্যানিং নয়—আশেপাশের গ্রামাঞ্চল থেকেও এ দুর্লভ অতিথিকে একবার দর্শন লাভের জন্য সকলেই অত্যন্ত ব্যাকুল। কিন্তু লঞ্চ যে ঘাটের কাছে ভিড়তেই পারছে না—কারণ ভাটায় জল একেবারে নেই—তাই ঘণ্টা দুয়েক অপেক্ষা জোয়ারের আশায়।কিন্তু মানুষেরও কি অদম্য উৎসাহ। বাঘটিকে যখন ট্রাকে তোলার ব্যবস্থা হচ্ছে তখন রাত দুটো। কিন্তু ক্যানিংয়ে তখন তো বাজার বসেছে মনে হচ্ছে। লোকজন সামলে পুলিশের সাহায্যে কোনও মতে মাননীয় অতিথিকে আপ্যায়ন করে ট্রাকে তুলে নিলাম। চিড়িয়াখানার অধিকর্তাকে যখন অতিথির সঙ্গে পরিচয় করালাম তখন বোধহয় প্রথম কি দ্বিতীয় ট্রাম চলছে কালীঘাটের রাস্তায়। সুন্দরবন জঙ্গল থেকে রাইচরণবাবুর বাড়ী হয়ে অতিথি এখন বহাল তবিয়তে কলকাতার চিড়িয়াখানার অধিবাসী। মুখ্যমন্ত্রী এ বাঘটিরই নামকরণ করেছেন 'সুন্দরলাল'।

বাঘ ও পূজার্চনা : লোকাচার

এটা পৌরাণিক সত্য যে, শিব যোগীবেশ ধারণ করে ব্যাঘ্রচর্মের উপর আসীন—সচরাচর এভাবেই তিনি উপস্থাপিত হয়ে থাকেন। কিন্তু তার স্ত্রী দুর্গা স্বয়ং এই প্রাণীটিকেই নিজের বাহন হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। সূর্য-সংশ্লিষ্ট পৌরানিক মতবাদ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটি বিশ্বাস আছে যে, ডাইনীরা বহু সময়েই বাঘের মূর্তি ধারণ করে এমন ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে যে, তাদেরকেও ঐ জন্যে একটি বিশিষ্ট মর্যাদায় ভূষিত করতে হয়।

ব্যাঘ্র পূজা-উপাসনার শুরুর ইতিহাস নিয়ে মতভেদ রয়েছে পুরাতত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে তবে এটা সত্যি যে বেশীরভাগ পুরাতত্ত্ববিদ্‌ই বিশ্বাস করেন যে কুলকেতু পূজার উৎস থেকেই সম্ভবত ব্যাঘ্র উপাসনা শুরু হয়। এ সম্পর্কে অন্য মতটি হচ্ছে যে বাঘ কোনও মানুষকে খাওয়ার পর তার আত্মাকেও বহন করে। বাঘের মৃত্যুর পর তার উপর সমস্ত প্রকার যাদু বিশ্বাস আরোপিত হয়। তার দাঁত, নখ, গোঁফ ইত্যাদি যাদুশক্তির জন্য মূল্যবান। বিশ্বাস যে এগুলি অশুভশক্তি, খারাপ দৃষ্টি। রোগ ও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রতিষেধক। বাঘের চর্বি, বাত এবং অনুরূপ ব্যাধির মূল্যবান ঔষধ গণ্য করা হয়। মানুষের বিশ্বাস যে এগুলি হৃদযন্ত্রের পক্ষে উপকারী ও শক্তি বাড়িয়ে দেয়, উত্তেজক এবং কামোদ্দীপক এবং যারা ব্যবহার করেন তাদের শক্তি এবং সাহস সঞ্চারিত হয়। অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য জনপ্রিয় কবচ হিসেবে বাঘ বা চিতার গোঁফ ও নখের মিশ্রণের সঙ্গে কিছু মন্ত্রপূত শিকড় বা ঘাস, তামার মাদুলিতে ভরে, গলায় বা হাতে ঝুলিয়ে রাখারও প্রচলন আছে। শিশুর জন্মানোর পরই নাকি এটির প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। বাঘের মাংসও একটি শক্তিশালী ঔষধ এবং যাদু-দ্রব্য বিশেষ ; গবাদি পশুর মধ্যে রোগের প্রাদুর্ভাব হলে গোয়ালে এটিকে দগ্ধ করা হয়। বাঘের মাংস, যদি তা পাওয়া সম্ভব না হয়—তখন

শেয়ালের মাংস চাষের ক্ষেতে পোড়ান হয়, শস্যের রোগ দূর করার জন্য। লোকের মতে এমন ধারণাও আছে যে কিছু বাঘ বিনয়ীর আচরণে তুষ্ট হয়। কেউ কেউ আবার এও মনে করেন যে, বিবাহ উৎসবে ব্যাঘ্র দেবতা বাঘেশ্বরের আশীর্বাদপুষ্ট অস্বাভাবিক শক্তিসম্পন্ন দুই ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। তারা হিংস্র শিকারীর মত ব্যা-ব্যা-ধ্বনিরত ছাগল ছানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং দাঁত দিয়ে চিবাতে থাকে যতক্ষণ না তার মৃত্যু হচ্ছে। একটি ভারতীয় প্রবাদে বলে যে, বাঘের লেজের চুল কারুর প্রাণ-বিয়োগের কারণ হতে পারে।

দক্ষিণ বঙ্গের মানুষের কাছ থেকে যে সমস্ত দেব-দেবী পূজা পেয়ে থাকেন তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল দক্ষিণরায় (অর্থাৎ দক্ষিণের প্রভু)। ইনি দক্ষিণ ঠাকুর (অথবা দক্ষিণের ঠাকুর)। দক্ষিণদার এবং কালুরায় দক্ষিণদার ইত্যাদি নামেও অভিহিত হয়ে থাকেন। এখানকার মানুষের বিশ্বাস যে এই সব দেবতা দক্ষিণ অঞ্চলের ভয়ঙ্কর সব বাঘেদের উপরে প্রভুত্ব করেন ও তাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করেন। তাদের আরও বিশ্বাস যে দক্ষিণরায়ের যারা পূজা করেন তারা নিজেদের ও তাদের গৃহপালিত পশুদের বাঘের অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে পারেন। সুন্দরবনের মানুষ তাই সুন্দরবনের মানুষখেকোর অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে দক্ষিণরায়ের পূজা করেন। তাদের বিশ্বাস যে দক্ষিণরায় বাঘের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করেন এবং শক্তি, উৎপাদন এবং উদ্দেশ্যের একটি মূর্ত প্রকাশ। এ দেবতাকে গ্রাম বাংলার অন্যতম দেবতা হিসেবেও মনে করা হয়—যার কোনও ঘর বা মন্দির নেই। সাধারণতঃ গ্রামের মধ্যে কোনও ফাঁকা জায়গায় এ দেবতার পূজা করা হয়ে থাকে। সমাজের নিম্নতম ব্রাত্যের দেব প্রতিনিধি হিসেবে দক্ষিণরায়কে মনে করা হয়ে থাকে। এ দেবতাকে আবার কেউ কেউ বৃষ্টির দেবতা হিসেবেও মনে করে থাকেন। বৃষ্টি আনা ও ফসল বন্য পশুর হাত থেকে রক্ষা করা নাকি এ দেবতার কর্মকাণ্ডের মধ্যে পড়ে। দক্ষিণরায়ের প্রধান পূজা অনুষ্ঠিত হয় পৌষ সংক্রান্তিতে অর্থাৎ ১৪/১৫ই জানুয়ারী প্রতি বছর। পূজা-অনুষ্ঠানে হাঁস বা মুরগি বলি দেওয়ার প্রথাও রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ব্যাঘ্র পূজার প্রচলনও বহুদিনের। অবশ্য এ পুজোর ধরন-ধারণ অন্যান্য অঞ্চল থেকে আলাদা ধরনের। কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন যে অন্যান্য অঞ্চলে বাঘের সঙ্গে মানুষের একটা টোটেম সম্পর্ক রয়েছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে নাকি এ সম্পর্কটার উৎস বাঘের ভীতি। দক্ষিণরায় সম্পর্কেও কোন কোন সমাজবিজ্ঞানীর মত ভিন্নতর। তাঁরা মনে করেন যে দক্ষিণরায় সুন্দরবন অঞ্চলের একজন বিখ্যাত শিকারী ছিলেন—যিনি তীর-ধনুকের সাহায্যে বহু বাঘ

ও কুমীর শিকার করেছেন। দক্ষিণরায়ের শিকারী সুলভ ক্ষমতাই নাকি তার উপরে দেবত্ব আরোপ করেছে বলে অনেকেরই অনুমান। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও হিন্দুদের মত বাঘের পূজা-অর্চনা নিয়ে বিভিন্ন রকম মতবাদ প্রচলিত। 'বনবিবি জহুর' কাব্যে একটি কাহিনী এ বিষয়ে উল্লেখ্য।

কলিঙ্গ নগরের অধিবাসী একজন সওদাগর কোন একদিন মধু সংগ্রহের জন্য তার ভাইপো দুখেকে নিয়ে সুন্দরবনে রওনা হয়েছেন নৌকা সহযোগে। এদিকে দুখের বিধবা মা বনবিবির কাছে প্রার্থনা জানাতে থাকলেন একমাত্র পুত্রের প্রাণ রক্ষার জন্য। লোকজন নিয়ে সওদাগর সুন্দরবন জঙ্গলে নেমে বহু চেষ্টা করলেন মধু সংগ্রহের জন্য কিন্তু দক্ষিণরায়ের ছলনায় এক ফোঁটা মধুও সওদাগর পেলেন না। পরিশ্রান্ত সওদাগর রাতে ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়লেন ও স্বপ্নে দেখলেন যে তিনি যদি তাঁর ভাইপো দুখেকে সমর্পণ করেন তবে তিনি প্রচুর মধু সংগ্রহ করতে পারেন। প্রস্তাবে সওদাগর প্রথমে অস্বীকৃত হলেও পরে মনস্থির করলেন যে দুখেকে তিনি সমর্পণ করবেন দক্ষিণরায়ের কাছে। এতে দক্ষিণরায় তুষ্ট হয়ে সওদাগরের নৌকা মধু ও মোমে ভর্তি করে দিলেন। যখন তারা এভাবে ফিরে আসছেন তখন হঠাৎ সওদাগর দুখেকে জলে ফেলে দিলেন ও দুখে কোনও মতে সাঁতার কেটে তীরে উঠে আসার চেষ্টা করল। তখন দক্ষিণরায় বাঘের মূর্তি ধরে দুখেকে গ্রাস করতে গেলে দুখেও চোখ বুজে বনবিবিকে স্মরণ করল—বনবিবি তখন দুখেকে কোলে তুলে নিলেন ও তার ভাই জঙ্গলীকে দিয়ে দক্ষিণরায়কে বনথেকে তাড়িয়ে দিতে গেলেন। ইতিমধ্যে দক্ষিণরায় আবার বড় খাঁ গাজীর শরণাপন্ন হলেন ও শেষে অবশ্য বনবিবি দক্ষিণরায়কে ক্ষমা করলেন। নিম্নবঙ্গের মুসলমানগণের পৃষ্ঠপোষকতায় আজও বড় খাঁ গাজী, কালু গাজী, বনবিবি প্রমুখের সঙ্গে দক্ষিণরায়ের প্রভাব সমানভাবেই রয়েছে। বড় খাঁ গাজী, কালু গাজী এবং দক্ষিণরায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই ব্যাঘ্র দেবতারূপে সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্জন করে আসছেন মূলতঃ সমগ্র ২৪ পরগনা ও মেদিনীপুর জিলায়।

ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বাঘ সিংহের থেকে প্রাচীনতর যদিও সিংহকেই পশুরাজরূপে আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। ভারতীয় কাহিনীগুলিতে যেখানেই সিংহের উল্লেখ আছে সেখানেই তাকে রাজকীয় গুণাবলীতে আরোপিত করা হয়েছে। সাধারণতঃ সে ভয়ংকর, নির্ভয় ও অতিশয় সামাজিক। অন্য দিকে বাঘ অসীম বলশালী, কিন্তু নিঃসঙ্গ। তবে সামাজিক প্রয়োজনে তাকেও অন্যদের সঙ্গে মিলিত হতে হয়। শিব বাঘের আসনে ধ্যান করেন, আবার দুর্গাও। দেবীর

কাহিনীতে ও ছবিতে সিংহ ও বাঘ উভয়েরই উল্লেখ আছে ; তবে শিবের সঙ্গে ব্যাঘ্রের সম্পর্ক থেকে হয়ত একথা বলা চলে যে দেবীর সঙ্গেও আগের সম্পর্ক ছিল ব্যাঘ্রেরই। বাংলায় তাই নানা প্রকারের পশুপূজার মধ্যে ব্যাঘ্র-পূজা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। অবশ্য পরবর্তীকালে পশু-পূজা পশুদেবতার পূজা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে যেমন হয়েছে ব্যাঘ্র দেবতার পূজা। একক পশু বা প্রাণী হিসেবে সাপ, গরু, হনুমান প্রভৃতিরা পূজা পেয়ে আসছে অন্য পশুদের কোন দেবতার বাহনরূপে দেখা যায়। পশু-পূজার সঙ্গে পশু পালন ও ভীতির সম্পর্ক আছে বলেই মনে হয়। পশ্চিমবাংলায় প্রায় প্রত্যেকটি দেবদেবীর সঙ্গে একটি করে পশু অথবা পাখী রয়েছে। দুর্গার বাহন সিংহ, বিশ্বকর্মার বাহন হাতি, শিবের বাহন বৃষভ, গণেশের বাহন ইঁদুর, ষষ্ঠীর বাহন বিড়াল, শীতলার বাহন গর্দভ, বড়খাঁ গাজীর বাহন ঘোড়া প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। পাখীর মধ্যে শনির বাহন শকুন, লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা, সরস্বতীর বাহন হাঁস, কার্তিকের বাহন ময়ূর প্রভৃতি। দক্ষিণরায়, সোনারায়, বনবিবি, বনদুর্গা, ভাণ্ডানী প্রমুখ দেব-দেবীর বাহন বাঘ। বাঘ প্রধানত লৌকিক স্তরের দেব-দেবীর বাহন হয়ে রয়েছে এবং শুধুমাত্র পুরুষ বা নারী দেবতার নয়, উভয়েরই বাহন হিসেবেই পরিচিত হয়েছে। এক বনবিবি বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন। কখনও তিনি বাঘের উপর শিশু সন্তানকে কোলে নিয়ে বসে আছেন ; কোথাও বা শুধু সন্তান কোলে নিয়ে আছেন। আঞ্চলিকতার প্রভাব বিভিন্ন দেব-দেবীর রূপ পরিগ্রহণের উপরে পড়লেও পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ জেলায়—কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, বীরভূম, বর্ধমান, ২৪ পরগনা, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের লৌকিক স্তরে ও জনমানসে ব্যাঘ্র দেবতার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। লৌকিক ব্যাঘ্র দেবতা সোনারায় কখনও কখনও আবার কৃষি দেবতার রূপও ধারণ করেন। কৃষকের কৃষিকার্যের সম্পদ-আহরণ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। ব্যাঘ্র বাহন সোনারায় অবশ্য পুরুষ দেবতা, উত্তরবঙ্গে ব্যাঘ্র বাহন নারী দেবতা আছেন—তাঁর নাম ভাণ্ডানী। আরও দুটি নামে তিনি পরিচিতা : ভাণ্ডারণী ও ভাণ্ডালী। ব্যাঘ্রবাহিনী এ দেবীর দক্ষিণ হস্তে বরাভয়, বামহস্ত কোলের উপর স্থাপিত। উত্তরবঙ্গে ভাণ্ডানী, সোনারায়, সোনারায়ের অনুচর রূপারায়, মহাকাল ছাড়াও "ব্যাঘ্রশূরের" পূজা করা হয়। ব্যাঘ্রশূরের বাঘের পিঠে বসা পুরুষ দেবতা। দুই হস্তে বিশিষ্ট মূর্তি। গ্রামের মধ্যে মাটির মূর্তি তৈরী করে ব্যাঘ্রশূরের পূজা দলবদ্ধভাবে করা হয়। ব্যাঘ্রশূরের বিসর্জন হয় না। পূজার স্থানেই রেখে দেওয়া হয়। কারণ গ্রামবাসীর বিশ্বাস যে ব্যাঘ্রশূর গ্রামে অধিষ্ঠান করলে

গ্রামবাসীদের কোনও উপদ্রব হয় না। উত্তরবঙ্গের মত দক্ষিণ বঙ্গের মেদিনীপুর ও ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবন অঞ্চলে দক্ষিণরায়, বাঁকুড়া রায়, বনবিবি, বড় খাঁ গাজী, কালুরায় প্রভৃতিকে ব্যাঘ্র দেবতা হিসেবে মনে করা হয়। দক্ষিণরায়ের মাথায় ঝাঁকড়া চুল, তার উপর মুকুট, কানে কুণ্ডল, চোখ দুটি গোল ও বড়—খানিকটা রক্তাভ, নাক টিকোলো, গোঁফ আকর্ণ-বিস্তীর্ণ, পরণে যোদ্ধার বেশ, ও হরিদ্রা বর্ণের। হাতে তীর-ধনুক, পিঠে ঢাল ও বাঘের উপর উপবিষ্ট। কোথাও কোথাও দক্ষিণরায়ের অনুষঙ্গ হিসেবে কালু রায়কেও দেখা যায়। ধান কাটার পর নবান্নের সময় দক্ষিণরায়ের ব্যাপক পূজা হয়। অন্য দিকে বৈসাদৃশ্য ও সাদৃশ্যের একটি সুন্দর মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায় বনবিবির মধ্যে। বাংলার লৌকিক দেবী, সুন্দরবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বনবিবি কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের কাছেই সমান ভাবে পূজিতা। ভক্তদের কাছে তিনি অবতার, গরীব-দুঃখীদের মা জননী, জগতের মাতা হিসেবে বনবিবি সমস্ত সমাজের মানুষের কাছে পূজিতা।

দক্ষিণরায়, সোনারায়, ভাণ্ডানী এবং বাঘ রায় চণ্ডী প্রমুখ দেব-দেবীর পূজায় বলিদান প্রথা রয়েছে। পাঁঠা, মুরগী, পায়রা বলি দেওয়া হয়। বনবিবিকে অর্থ হিসেবে বলির পরিবর্তে জঙ্গলে মুরগী ছেড়ে দেওয়া হয়। ভাণ্ডানী পূজাতে কোথাও কোথাও বলির পরিবর্তে পায়রা আকাশে উড়িয়ে দেওয়া হয়। বিমূর্ত বাঘ রায় চণ্ডীকে মুরগী বলি দিতে দেখা যায়। বাংলায় শুধু ব্যাঘ্র দেবতার পূজা নেই, ব্যাঘ্র নিয়ে পালা গান আছে। ব্যাঘ্র নিয়ে লোকনৃত্য ও অভিনয় বর্ধমান জেলায় ভৈটা গ্রামে হতে দেখা যায়। যে সকল চরিত্র অভিনয়ে থাকে তার মধ্যে মুখ্য হচ্ছে বেদে, মোড়ল, ওঝা, চৌকিদার, বেদের স্ত্রী এবং দুটি ব্যাঘ্র চরিত্র প্রধান। বাঘের আক্রমণে আহতকে আরোগ্যের জন্যেও ছড়া কাটা হয়। কখনও কখনও সেই ছড়া গানে প্রকাশ করা হয়। বাঘ-কেন্দ্রিক লোক-নৃত্যাভিনয় ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাসজাত ছড়া বাঘ পূজা বা ব্যাঘ্রবাহন দেবতার আদিম রূপের বিপুল স্মৃতির স্মারক হয়ে রয়েছে।

ভারতের প্রাচীনতম মুদ্রা হরপ্পার সীলমোহরে যোগাসনে উপবিষ্ট একটি মূর্তির দু'পাশে চারটি পশু মূর্তি লক্ষ্য করা যায়—বাঘ, হাতি, গণ্ডার ও মোষ। হরপ্পা শিল্পের কোনও কোনও মুদ্রায় ব্যাঘ্ররূঢ়া দেবীর চিত্র আছে। মহেঞ্জোদারোতেও ব্যাঘ্রবাহনা দেবীমূর্তির 'সীল' পাওয়া গেছে। এ থেকে মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা সমাজে ব্যাঘ্রবাহন দেবদেবীর সন্ধান পাওয়া যায়। মালদহ মিউজিয়ামে দশম শতাব্দীর গৌড়ীয় শিল্পের একটি অভিনব মূর্তি

সংগৃহীত হয়েছে। মূর্তিটি কালো পাথরে তৈরী ও চমকপ্রদ, বাঘের পিঠে ঘোড়সওয়ারের ভঙ্গীতে বসে আছেন একটি দেবমূর্তি। উপরের অঙ্গ রায়মল্ল ও নিচের অঙ্গ ব্যাঘ্র এইরূপ চিত্রিত একটি পোড়ামাটির মুর্তি বিশ্বভারতীর কলাভবন সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যে বাঘের স্মৃতি অতি পুরোনো। ভারতবর্ষের আদি গ্রন্থ 'বেদে' ব্যাঘ্রের উল্লেখ রয়েছে। ঋকবেদে ও অথর্ববেদে বিভিন্ন শ্লোকে ব্যাঘ্রের উল্লেখ লক্ষণীয়। বৌদ্ধ 'ব্যাঘ্রজাতকে' বৃক্ষ-সম্পৃক্ত ব্যাঘ্র-মানবের এবং ব্যাঘ্র-সিংহযুক্ত দু'জন দেবতার কথা উল্লেখিত রয়েছে। 'মারুত-জাতকে' ও বাঘের দেখা পাওয়া যায়। তন্ত্রশাস্ত্রেও ব্যাঘ্রবাহনা দেবীর সন্ধান পাওয়া যায়। 'প্রপঞ্চসার তন্ত্রে' অভিচারিকাদেবীর বাহন বহুস্থলেই এ ব্যাঘ্র।'শিবপুরাণে' দেবী কালীর বাহন বাঘ 'সোমনন্দী', 'ধর্মপুরাণে' দেখা যায় পূজার বলি স্বরূপ অজার বহির্দ্বারে 'বাঘসেন' অবস্থান করলেন। 'বরাহপুরাণে' দেখা যায় শিব, পুত্র গণেশকে দিয়েছেন পরবার জন্য ব্যাঘ্রচর্ম। কখনও কখনও মনসাদেবী এবং শীতলাদেবীকেও ব্যাঘ্রচর্ম পরতে দেখা যায়। উত্তরবঙ্গে আদিম বংশোদ্ভূত কোচরাজাদের কুলদেবী ভরানীও ব্যাঘ্রবাহনা। কোচবিহার রাজবংশের সঙ্গে বাঘের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। কোচবিহার রাজ নরনারায়ণ কর্তৃক কামাখ্যা পাহাড়ে নির্মিত মন্দিরের উঠানে খোদিত আছে 'বাঘচাল' নামে খেলার ছক। দুটি বাঘ ও কুড়িটি ছাগল নিয়ে এই খেলা হয়ে থাকে। 'বাঘচাল' আর কিছুই নয় 'বাঘবন্দী' খেলা। উত্তরবঙ্গের প্রভাব নেপালেও পড়েছে ও তাই সেখানে 'বাঘযাত্রা' নামে এক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সাঁওতাল পুরাণেও বাঘের উল্লেখ রয়েছে। উত্তরবঙ্গের আদিম লৌকিক সমাজে বাঘের স্মৃতি ওতপ্রোতোভাবে জড়িয়ে আছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও বাঘের প্রভাবের উল্লেখ রয়েছে। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডেও সুবর্ণদেহী মানুষের এবং ঐ প্রসঙ্গে নররূপী ব্যাঘ্র অর্থাৎ ব্যাঘ্রের ন্যায় প্রতাপশালী ব্যক্তির উল্লেখ আছে। আদিম মানুষ মনে করত বাঘের শক্তি, সাহস এবং ধূর্ততা নিজের চেয়েও অনেক বেশী এবং বাঘ দেবতারই আত্মাপ্রাণী। তাই বাঘ আদিম মানুষের মনে দেবত্বে উন্নীত হয়েছে। রুদ্র শিব হচ্ছে কৃষি দেবতা। কৃষির অন্যতম উপাদান গরু; গোসম্পদ রক্ষার জন্য উত্তরবঙ্গের কৃষকগণ তাই ব্যাঘ্র পূজা করে থাকেন। এই ব্যাঘ্র দেবতা কোথাও 'রায় গোসাঞী সোনাই', কোথাও বা ব্যাঘ্রবাহন 'মহারাজা' আবার কোথাও 'ডাংধরা' এবং অন্যত্র 'সোনারায়'। 'কামাখ্যা', 'রণপাগলী', 'ভাণ্ডানী' প্রভৃতি স্ত্রীমূর্তিতেও বাঘের পূজা হয়ে থাকে। মুসলমান সমাজেও ব্যাঘ্র সমানভাবে পূজিত হয়ে থাকে উত্তরবঙ্গে। 'সোনাপীর', 'মানিকপীর', 'সত্যপীর'

প্রভৃতি নানা ব্যাঘ্রবাহন পীরের কথা আছে। উত্তরবঙ্গে মুসলমান ও ইংরেজ শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার পর এবং স্বাধীনতা উত্তর দেশ বিভাগের অনিবার্য পরিণতিতে বাঙালীর সমাজে ও ধর্মে যে পরিবর্তন এসেছে তার ফলে মানুষের মূল্যবোধেও গুরুতর পরিবর্তন হয়েছে। তা সত্ত্বেও আদিম ব্যাঘ্র-দেবদেবীর পূজক 'পণ্ডিত', 'দেউসী', 'মালাকার' ও 'অধিকারী'গণ এখনও অপ্রতিহত মর্যাদার অধিকারী। উত্তরবঙ্গে ব্যাঘ্র বিশ্বাসের বহু নিদর্শন রয়েছে। দার্জিলিং শহরের যে স্থান থেকে অতি ভোরে সূর্যোদয় দেখা যায় তার নাম বাঘের পাহাড় বা Tiger hill, বনের সঙ্গে কাঠুরিয়াদের সম্পর্ক অতি গভীর। কাঠুরেরা বনে রওনা হওয়ার সময় তাদের সঙ্গে অতি অবশ্যই একজন ওঝা থাকে। বৃদ্ধেরা প্রয়োজনীয় উপদেশ দেয়, বৌ-ঝিরা বাড়ীঘর পরিষ্কার করে। বাড়ীর বয়োবৃদ্ধা রমণী কাঠুরেদের সঙ্গে দেবার জন্য চাল, মুড়ি, চিঁড়ে প্রভৃতি ভাজে। নববিবাহিতা বধূরা বাঁ হাতের চুরিটা খুলে বালিশের তলায় রাখে যতদিন স্বামী জঙ্গল থেকে ফিরে না আসে ততদিন সে চুড়িটা হাতে পরে না। এ ধরনের প্রথা সুন্দরবনের মানুষের মধ্যে চালু আছে। সেখানে কোনও কোনও অঞ্চলে বিবাহিতা রমণীরা স্বামীকে সুন্দরবনের জঙ্গলে পাঠিয়ে বৈধব্য জীবন যাপন করেন যতদিন না তিনি ফিরে আসেন।

পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে দেবতাদের সঙ্গে বাঘের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। গ্রীসে দিওন্যুসাস দেবতার সঙ্গে যুক্ত ব্যাঘ্র, বিপর্যয় ও ক্রূরতার প্রতীক। চীনে সে অন্ধকার ও চন্দ্রিমার প্রতীক। শক্তি ও সামর্থের পরিচায়ক ভারতীয় বাঘ। পশ্চিমবাংলায় বাঘ সৌন্দর্য, শক্তি ও সাহসের মূর্ত প্রতীক। ভারতীয় শাস্ত্রে ব্যাঘ্র, বিড়াল, কুকুর, শৃগাল ও হাতি—যে 'পঞ্চনখী'র কথা রয়েছে বাঘ তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। লোকসমাজ ও লোককথার সঙ্গে বাঘের সম্পর্কও অত্যন্ত নিবিড়। সাঁওতাল আদিবাসী মনে করেন, বাঘ যেমন যৌবন ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, সবল ও তেজী—কোনও রুগ্ন শিশুকে যদি বাঘের মাংস খাওয়ানো যায় তবে পরবর্তী জীবনে সে বাঘের মতই গুণশালী হয়ে উঠবে। বাঘের মাংস সবসময় পাওয়া যায় না। তাই টুকরো মাংস শুকিয়ে রাখারও চল হয়েছে। এঁরা বিশ্বাস করেন বাঘের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যকরী ক্ষমতা রয়েছে। যেমন ছেলেদের বশীভূত করার জন্য মেয়েরা বাঘের গোঁফ ব্যবহার করেন। সাইবেরিয়া ও তুর্কীস্থানের মানুষের বিশ্বাস বাঘের রোগ-নিরাময় করবার ও দেহকে রক্ষা করবার বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে এবং পুরুষত্বহীনতায় ও দেহগত কামনায় আরও বলিষ্ঠতা প্রয়োগে বাঘের বিশেষ বিশেষ অঙ্গের ব্যবহারে অনিবার্য

সুফল পাওয়া যায়। রোগ নিরাময় ও দৈহিক শক্তি ছাড়াও বাঘ সম্পর্কে কয়েকটি বিশ্বাস লোকসমাজে আজও প্রচলিত রয়েছে। বাঘের লোককথাগুলির অধিকাংশই খাদ্য সংগ্রাহক জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি। মানুষ যখন কৃষির ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়নি, কিংবা কৃষিকাজ জানলেও পুরোনো অভ্যাস ত্যাগ করতে পারেনি, তখন বাধ্য হয়ে তারা গভীর বনভূমিতে যেত। ফল-মূল-কাঠ-মধু-জ্বালানী প্রভৃতি সংগ্রহের জন্য মানুষকে বনে যেতেই হত। বনের পশুর সঙ্গে তাই মানুষেরও সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াল। সিংহ, বাঘ, বুনো হাতি প্রভৃতি কয়েকটি জন্তু ছিল মানুষের কাছে বিভীষিকা। মানুষ তাই সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য অদেখা শক্তির প্রতি প্রণতি জ্ঞাপন করত, বন্যজন্তুকে মন্ত্রে মুগ্ধ করারও চেষ্টা করত। সুন্দরবনের মধু ও কাঠ সংগ্রহকারীদের মধ্যে আজও এসব মন্ত্র-তন্ত্রের চেষ্টা লক্ষ্যণীয়। এইভাবেই বাঘকে সন্তুষ্ট করবার জন্য নানা নিষেধের জন্ম নিয়েছে ও সঙ্গে সঙ্গে বাঘের বিক্রম ও বুদ্ধি কৌশলের নানা লোককথাও গড়ে উঠেছে কালে কালে। বনভূমি থেকে দূরে যারা বিস্তৃত কৃষিজমিতে চাষ করে জীবনযাপন করে, তাদের সঙ্গে বাঘের পরিচয় নেই বলেই লোককথায় সে স্থান পায়নি। আর খাদ্য-সংগ্রাহক গোষ্ঠীর প্রতিদিনের ভীতির বস্তুটি অতি চেনা, জীবনহানিকর হলেও অতিশয় কাছের। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে অধিকাংশ লোককথার স্রষ্টা লোকসমাজের নারীরা। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে। অবসরের সময় উত্তর পুরুষের কাছে গল্পের ভাণ্ডার উন্মোচন করেন নারীরাই। কিন্তু বাঘের লোককথাগুলি কিন্তু এর ব্যতিক্রম। এগুলি পুরুষেরই সৃষ্টি মূলতঃ। পশুরাজ্যের রাজ আসনটি পশুরাজ সিংহের দখলে থাকলেও বাংলার লোকসাহিত্যের রাজ্যে কিন্তু সেই সিংহাসনে সিংহের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে বাঘ। বস্তুতপক্ষে বাংলা লোকসাহিত্যের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে বাঘের যে রাজকীয় আধিপত্য, দোর্দণ্ড প্রতাপ সে ক্ষেত্রে পশুরাজ সিংহের ভূমিকা কিন্তু নিতান্তই ম্লান। যেহেতু বাঙালীর অভিজ্ঞতায় সিংহ অপেক্ষা বাঘ অনেক বেশী প্রত্যক্ষ তাই বাংলা লোকসাহিত্য বাঘকেই মুখ্যতর আসন দিয়েছে।

বাঘ ও সুন্দরবন এ দুটি শব্দই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। জনসংখ্যার মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি অরণ্যভূমিকে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত করছে যার অর্থ হল বাঘের আবাসস্থলের সঙ্কোচন। তাই প্রয়োজনের তাগিদে মানুষকে যখন বাঘের ও ক্ষয়িষ্ণু আবাসস্থলে যেতে হয় তখন মানুষ ও বাঘের মধ্যে সংঘাত হয় অনিবার্য ও এর ফলশ্রুতিতে মানুষ বাঘের শিকার হয়। এ ভাবেই সুন্দরবনের মানুষের সঙ্গে বাঘের পরিচয় ঘটে দুঃখ ও ক্ষতি সাধনের মাধ্যমে। তাই লোকজীবনে ও

সাহিত্যে বাঘের ভূমিকা অনন্য সাধারণ। কিন্তু প্রবাদের ক্ষেত্রে বাঘের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি, সুযোগসন্ধানী চরিত্র ও নখের তীক্ষ্ণতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলির যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অন্য দিকে বাঘের হিংস্রতা, মাংস লোলুপতা প্রভৃতি দিকগুলির উপরে জোর দেওয়া হয়েছে ছড়াগানের ক্ষেত্রে। যুগের পর যুগ ধবে লোকশিল্পীরা পরিচিত পশুপাখী নিয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ যে লোকশিল্প সম্ভার সৃষ্টি করে গেছেন তা আজ সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। এদের মধ্যে বাঘের ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখ্য। অন্ধ্রে ও মহারাষ্ট্রে নওরাত উপলক্ষে অম্বাদেবীর যে মূর্তিপূজা হয়, তিনি ব্যাঘ্র-উপবিষ্টা। দারুতক্ষণ শিল্প বা কাঠের কাজ বাংলার লোকশিল্পকলার চমৎকার নিদর্শন। এ শিল্পেও বাঘের ভূমিকা মুখ্য। পুতুল তৈরী শিল্পেও বাঘ স্থান পেয়েছে লোকশিল্পীর তুলিতে। পশ্চিমবঙ্গের কালীঘাটের পটশৈলীতে বাঘের ভূমিকা উপেক্ষণীয় নয়। লৌকিক কিংবদন্তী অনুসারে দক্ষিণরায়ের মুণ্ড পূজা হয়, কারণ লৌকিক বিশ্বাস দক্ষিণরায় বাঘের দেবতা এবং দক্ষিণরায়ের পূজা না করলে বনাঞ্চলে কাষ্ঠ-আহরণ, মধু সংগ্রহ, মৎস্য শিকার ইত্যাদি জীবিকায় সাফল্য লাভ হবে না। যেহেতু লোকশিল্প লোকজীবন-নির্ভর তাই বাঘ লোকশিল্পে বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। ফলে, উচ্চশ্রেণীর জনগণের দৃষ্টিতে বাঘ ততটা আদরণীয় না হলেও নিম্ন শ্রেণীর জনমনের ইচ্ছায় লৌকিক দেবদেবীর কাহিনীর প্রেক্ষাপটে যুগ যুগ ধরে চিত্রিত খোদিত হয়ে আপন মহিমায় মহিমান্বিত। সুন্দরবনের বাঘ এ অঞ্চলের মানুষের কাছে শিব ও অশিব দুয়েরই জীবন্ত প্রতিমূর্তি হলেও, এ অঞ্চলের মানুষের কিন্তু সুন্দরবন বাঘের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই তাদের সমস্ত অভিযোগ হচ্ছে নিজেদের ভাগ্যের বিরুদ্ধে। কালান্তক মৃত্যু সদৃশ বাঘ ও জীবনবাদী মানুষের মধ্যে সহাবস্থানের এমন প্রত্যক্ষ নিদর্শন সভ্য পৃথিবীতে বিরল। এমনকি মানুষখেকো বাঘ সম্পর্কেও তারা অচ্ছেদ্য ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী।

মানুষখেকো বাঘ ও সুন্দরবনের মধু

মধু-চলতি কথায় মৌমাছিরই একটি মধুর আশ্চর্য দান। এর ভাবগত দিকটা নিকট প্রিয়জন, মধুর, সতেজ, বিশুদ্ধ এবং স্বর্গীয় অর্থের সঙ্গে জড়িত।

আমরা অবশ্য বস্তুর কারবারি। ব্যবসায়ে ভাবের কোন স্থান নেই। ব্যবসা উৎপাদন নির্ভর। এ নিবন্ধে মধু উৎপাদনের বিভিন্ন বিষয় ও নদী-নালায় ভরা সুন্দরবনে মৌমাছির আশ্চর্য স্বভাব-বৈচিত্র্য নিয়ে অতি সংক্ষিপ্ত পরিসর আলোচনা করা হয়েছে। অবশ্য এর পর্যালোচনাযোগ্য দিকগুলিও কম মধুর নয়। এবং মধু(র) রসের রসিকদের তা কম ভাল লাগার কথা নয়।

সুন্দর বনের স্যাঁতসেঁতে বনভূমির বিরাট ব্যাপ্তি অতিশয় ঘন ও প্রকৃতপক্ষে অপ্রবেশ্য। এই ব্যাপ্ত বনাঞ্চল প্রতি মার্চ থেকে জুন মাস অবধি 'এপিস ডরমাটা' নামে মৌমাছির বিস্তীর্ণ আবাসক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়। সুন্দর-বনের বৈচিত্রপূর্ণ বৃক্ষরাজির সুগন্ধ পুষ্পরাজি থেকে লক্ষ লক্ষ মৌমাছির ঝাঁক পরাগ আহরণে ; মৌচাক গঠনে ব্যাপৃত হয়।

যে বনভূমিতে বিষাক্ত বিভিন্ন সাপ, তীক্ষ্ণ-ধারালো দেঁতো হাঙর, ভয়ঙ্কর কুমির, এবং ততোধিক ভয়ঙ্কর অভিনব ও চতুর বাঘের পাশাপাশি অনুপম হরিণ-শাবকের বাসস্থান ; সেখানে এই অতিবিচিত্র মৌমাছির ব্যবহারিক গঠনবৈচিত্র্যের অনুসন্ধান বৈজ্ঞানিক গবেষণার অংশবিশেষ। এবং পরস্পর-বিরোধী চরিত্র গুণসম্পন্ন পরিজন-পরিবৃত এই আশ্চর্য বনভূমিতে মধুসংগ্রহ কর্মটি যারপর নাই তিক্ত, বিপদসঙ্কুল এবং পরিশ্রম সাপেক্ষ। অথচ এই অমানুষিক অভিনব কর্মকাণ্ডটিতে সুন্দরবনের জেলে, কাঠুরে, কৃষক ইত্যাদি সাধারণ মানুষেরাই অংশ নিয়ে থাকে।

মধু'র আলোনার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রনিধানযোগ্য নিম্নলিখিত বিষয়আশয়গুলি সম্প্রতি গবেষণা ভিত্তিক পঠন-পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা শুরু

হয়েছে। পঠন পদ্ধতিক্রম-এর মধ্যে থাকছে : (১) সুন্দরবনের এলাকা বিশেষে মৌচাকের সংখ্যা অনুসন্ধান, (২) তাদের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ, ভূমি থেকে উচ্চতা ও পারস্পরিক মধু ও মোম উৎপাদনের পরিমাণ নির্ণয়, (৩) এরূপ উপায়ও বিশেষভাবে তৈরী একটি গবেষণামূলক বিবরণীতে লিপিবদ্ধকরণ, (৪) অসংখ্য মধু সংগ্রহকারীদের জিজ্ঞাসাবাদ এবং সংগৃহীত উপায়ও পূর্বোক্ত বিবরণীতে সংযুক্তকরণ, এবং (৫) ভিন্ন ভিন্ন পরাগ সম্বলিত মধু অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা।

গবেষণামূলক পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি (১) মৌচাক তৈরীতে ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষ সামগ্রীর সংখ্যাতাত্ত্বিক মূল্যায়ণ, এবং মৌমাছির মৌচাক গঠনে পারস্পরিক পছন্দ। (২) মৌচাকের গঠন ও মধু ও মোম উৎপাদনের পারস্পরিক সম্পর্কের উদ্ঘাটন ; (৩) ভূমি থেকে মৌচাক তৈরীর পারস্পরিক উচ্চতা ও মধু ও মোমের উৎপাদন সম্পর্ক : (৪) মৌমাছির পুস্পপরাগ আহরণের ব্যবহার বৈচিত্র্য, এবং (৫) মধু আহরণের প্রকৃষ্ট সময় প্রভৃতি।

এই অবসরে বলে রাখা ভাল যে, 'পঠন পাঠক্রম পদ্ধতি' এবং 'গবেষণামূলক পাঠক্রম পদ্ধতি' অতি সম্প্রতিকালের সূচনা। বিস্ময়করভাবে ভগ্ন ভয়ঙ্কর খাড়ি সঙ্কুল নদীনালার বিস্তীর্ণ জালে জড়ানো সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলময় প্রদেশে এ জাতীয় উভয়বিধ কাজের হাজারো বাস্তব অসুবিধার দরুন সঠিক ও সুনির্দিষ্টভাবে সামগ্রিক কাজের সিদ্ধান্তে আসতে আরও দীর্ঘ সময় আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। আগ্রহী সাধারণের জিজ্ঞাস্য অনেক ব্যাপার অতএব তাই উপরিউক্ত বিভাজন অনুযায়ী দেওয়া সম্ভব নয়। সাধারণ ভাবে জ্ঞাতব্য অদ্যাবধি কাজের কিছু ফলাফল দেওয়া গেল :

মৌচাক গঠন ও বৃক্ষরাজির পারস্পরিক সম্পর্ক : অদ্যবিধ গবেষণা ভিত্তিক মূল্যায়ণে দেখা যায় যে নিম্নলিখিত বৃক্ষরাজি মৌচাক গঠনে সাহায্য করে এবং তাদের পারস্পরিক শতকরা আনুপাতিক হার নিম্নরূপে :

বাইন :	১৬ ভাগ	গেঁওয়া:	৩৯ ভাগ	ধূন্দল :	১·৯ ভাগ
পশুড় :	২·৮ ভাগ	কাঁকড়া :	৩·৫ ভাগ	গরান :	৯১ ভাগ
গর্জন :	১০ ভাগ	সুন্দরী :	৯ ভাগ	কেওড়া :	৫·৩ ভাগ
		অন্যান্য :	১-৫ ভাগ		

গেঁওয়া অন্যান্য বৃক্ষরাজি অপেক্ষা মৌমাছিদের কাছে মৌচাক তৈরী সম্পর্কে অধিকতর বেশী পছন্দ। পরে পরে বাইন, গরাণ, গর্জন ও সুন্দরী। কেওড়া

গাছের অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও সুবিস্তৃত ছায়াময় শাখাপ্রশাখা আকৃতি সত্ত্বেও আশ্চর্যজনক ভাবে মৌমাছিদের না-পছন্দ। মৌমাছিরা নদী ও খালের একাবারে তীরে অবস্থিত বৃক্ষরাজি মৌচাক তৈরীর কাজে ব্যবহার করে না। উপরিউক্ত বিশেষ-বিশেষ গাছের প্রজাতি ভিত্তিক পছন্দ না-পছন্দ, প্রতি জাতের গাছের পুষ্প ও পরাগের ধর্ম ও গুণ যা মৌমাছিদের মৌচাক গঠনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয় সবই গবেষণাধীন।

মৌচাকের গঠন ও মধু ও মোম উৎপাদন :

সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অরণ্যানীর অসংখ্য মৌচাক সমষ্টির মধ্যে প্রস্থ ও ঘনত্বের পারস্পরিক উপাত্তের তাৎপর্যপূর্ণ তারতম্য খুব একটা দেখা যায় না। কিন্তু দৈর্ঘ্যটি আবশ্যিকভাবে ভিন্ন ভিন্ন হয়। সবচেয়ে বেশী মৌচাকের দৈর্ঘ্য ১২০ সেন্টিমিটার, মাঝামাঝি মৌচাকের দৈর্ঘ্য ৭৫ থেকে ৯০ সেন্টিমিটার, এবং সবচেয়ে কম মৌচাকের দৈর্ঘ্য ৩৭ থেকে ৪৫ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে। এবং ১ ঘনফুট মৌচাক থেকে আনুমানিক ৩ কিলোগ্রাম মধু, ১-২৫ ঘনফুট মৌচাক থেকে ৪ থেকে ৬ কিলোগ্রাম মধু ১-৫ ঘনফুট মৌচাক থেকে আনুমানিক ১০ কিলোগ্রাম ও ২ ঘনফুট মৌচাক থেকে আনুমানিক ১৪ কিলোগ্রাম মধু পাওয়া যায়। অবশ্য মধুর পরিমাণগত উৎপাদনকে নিম্নলিখিত উপাদান কমবেশী প্রভাবিত করে :

(১) মৌচাকের যথাযথ শোধন, (২) প্রকৃষ্ট আবহাওয়া, (৩) মৌচাকের গঠন, (৪) মৌচাকের প্রথম বা দ্বিতীয় গঠন, (৫) ভূমি থেকে মৌচাকের অবস্থিতির উচ্চতা, (৬) বৃক্ষরাজির প্রকৃষ্ট পুষ্পের সমারোহ এবং (৭) অন্যান্য আরও প্রাকৃতিক ও ব্যবহারিক কারণ যা এখনও অনুশীলন অধীন।

তাছাড়া, সাধারণতঃ মৌমাছির ঝাঁক কোন একটি গাছে কেবলমাত্র একটি মৌচাক গঠন করে। শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগ ক্ষেত্রে একই গাছে দু'টি মৌচাক দেখা যায় ; তবে এর অধিক কস্মিনকালেও দেখা যায় না। দ্বিতীয়তঃ সমীক্ষায় দেখা গেছে যে মৌচাক তৈরীর স্থান প্রতি সময়ই নতুন নতুন হয় ও কেবলমাত্র শতকরা ৭ ভাগ ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত মোম লাগানো স্থানে দ্বিতীয়বার মৌচাক গঠন করে। সেক্ষেত্রে প্রথমবার গঠিত মৌচাকের আকৃতি দ্বিতীয়বার থেকে বড় হয়।

বেশীরভাগ মৌচাকই ভূমি থেকে খুব কম দূরত্বে হয়। অনুশীলনে দেখা গেছে যে ভূমি থেকে ২·৫ মিটার দূরত্বে গঠিত মৌচাকই মধু উৎপাদনে প্রকৃষ্ট। লক্ষ্যণীয়, প্রকৃতির অপূর্ব শৃঙ্খলায় শতকরা ৭৫ ভাগ ক্ষেত্রেই মৌচাক ২·৫ মিটার দূরত্বের নীচে গঠিত হয়।

সময়ভেদে মধু উৎপাদনের পরিমাণ নির্ণয় :

১লা এপ্রিল থেকে ১৫ই এপ্রিল ... মধু উৎপাদনের শতকরা ৪০·৮ ভাগ সংগৃহীত হয়

১৬ই এপ্রিল থেকে ৩০শে এপ্রিল ... মধু উৎপাদনের শতকরা ৩৩·২ ভাগ সংগৃহীত হয়

১লা মে থেকে ১৫ই মে ... মধু উৎপাদনের শতকরা ২০·০ ভাগ সংগৃহীত হয়

১৬ই মে থেকে ৩১শে মে ... মধু উৎপাদনের শতকরা ৪·৪ ভাগ সংগৃহীত হয়

১লা জুন থেকে ১৫ই জুন ... মধু উৎপাদনের শতকরা ১·৬ ভাগ সংগৃহীত হয়

মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত প্রতিবছর প্রথম পর্যায়ে উক্ত মৌমাছি (এপিস্ ডরসাটা) সুন্দরবনে আসে কেন ? প্রশ্নটি প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের আকৃষ্ট করেছে। শতকরা ৭৫ থেকে ৮৫ ভাগ আর্দ্রতাবিশিষ্ট সুন্দরবনের রকমারি সুগন্ধি ফুলের রাজ্যে বছরের ঐ সময়টুকু (মার্চ-জুলাই) বাতাস ভারি হয়ে থাকে এবং একটানা বৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়া সঙ্গে ফুলে ফেঁপে ওঠা জলের তুফান মধু উৎপাদনের ও আহরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

কিন্তু মধু আহরণ পদ্ধতি সুন্দরবনের ক্ষেত্রে অতি শোচনীয় বিয়োগান্ত নাটক সৃষ্টি করে থাকে কারণ এ দু মাসে (এপ্রিল/মে মাস) প্রতি বছরই দশ থেকে বারো জন মানুষ সুন্দরবনের মানুষখেকোর শিকার হয়। তাই মধু আহরণের পেশায় মানুষের নিদারুণ বিপদের ঝুঁকি বহন করে থাকে। তা সত্ত্বেও মানুষ প্রতি বছরই মধু আহরণ করে নিদারুণ দারিদ্র্যের কারণে। সুন্দরবনের মানুষখেকো বাঘকে মধু আহরণ কারীরাও তাদের স্বাভাবিক পরিবেশের একটি অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করে থাকে—কারণ বাঘ তাদের গ্লানিময় জীবন যাপনের একটি বিশেষ অঙ্গ ছাড়া অন্য কিছু নয়—যার বিরুদ্ধে কোন নালিশ চলে না।

বাঘ কী করে গোনা হয় ?

অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন বাঘ কী করে গোনা যায়। যাকে প্রায় দেখাই যায় না, তাকে আবার গোনা হয় কী ভাবে ? সত্যি সত্যি ব্যাপারটা অত্যন্ত চমকপ্রদ। আমরা সকলেই জানি মানুষ কী ভাবে গোনা হয়। লোক-লস্কর বাড়ি বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞেস করে তবেই মানুষ গোনা সম্ভব। আর বাঘের না আছে নির্দিষ্ট কোনও থাকার জায়গা, না আছে তাদের যাতায়াতের কোনও হিসেবনিকেশ। কিন্তু এতসব অসুবিধে সত্ত্বেও বাঘ গোনা হয় এবং সেই গণনা অনুযায়ী জানিয়ে দেওয়াও সম্ভব হয় যে, কোন বনে কত বাঘ আছে—ক'টি পুরুষ, ক'টি স্ত্রী ও ক'টিই বা বাচ্চা।

ব্যাপারটা মোটামুটি এরকম। কোনও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষণপ্রাপ্ত গণনাকারীকে কোনও বিশেষ বনে বাঘ গোনার কাজে নিয়োগ করা হয়। কয়েকটি বিশেষ বিশেষ তথ্য গণনাকারীরা সংগ্রহ করেন। কোনও বিশেষ স্থানে কয়টি বাঘের পায়ের ছাপ পাওয়া গেল। সে ছাপগুলির বিশেষত্ব কি সেটি নির্ণয় করা। কারণ বাঘের পায়ের ছাপ দেখে কোন্‌টি পুরুষ, কোন্‌টি স্ত্রী আবার কোন্‌টি বাচ্চা বাঘ সেটি নির্ণয় করা বিশেষজ্ঞের পক্ষে সম্ভব। তবে পায়ের ছাপটি সঠিকভাবে পাওয়া দরকার। প্ল্যাস্‌টার অফ-প্যারিস দিয়ে মাটি থেকে পায়ের ছাপ তুলে নিয়ে তাতে নম্বর দিয়ে দেওয়া গোনার কাজের একটি প্রাথমিক পর্যায়। তা ছাড়া গণনার সময়ের মধ্যে বাঘের মলমূত্র ত্যাগ করা ঘটনা নির্ণয় করা, গাছের উপরে—মাটিতে বা অন্য কোথায়ও বাঘের নখের আঁচড় বা অন্য কোন চিহ্ন পেলে সেটি গণনার জন্য বিশেষভাবে তৈরী পরিসংখ্যানে লিপিবদ্ধ করা ও সেটি কি ধরনের (পুরুষ, স্ত্রী বা বাচ্চা) বাঘ তাও বুঝতে চেষ্টা করা। কোনও বাঘের গলার আওয়াজ পেলে সেটি পরিসংখ্যান ভুক্ত করা। যদি সচক্ষে দেখা যায় তো কথাই নেই, সেটি পরিসংখ্যান লিপিতে সঠিকভাবে বর্ণনা

করা—কোন্ স্থানে কোন্ সময় দেখা গেল। বাঘের পায়ের ছাপ নেওয়ার অন্তর্নিহিত বিষয় হচ্ছে যে এটা ধরে নেওয়া হয় যে কোন বিশেষ মাটিতে দুটো আলাদা বাঘের পায়ের ছাপ আলাদা হবে—এরই উপরে ভিত্তি করে গণনার কাজে এগিয়ে যাওয়া।

যত বেশি শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী এ কাজে অংশগ্রহণ করেন, ততই গণনার কাজ সফল হওয়া সম্ভব। কারণ কর্মীর সংখ্যা বেশি হলে গণনার সময় কোনও বিশেষ স্থানে কম হবে আর গণনার সময় যত কম হবে ততই বাঘের গমনাগমনের ঘটনাও কম হবে। তবে কোনও বিশেষ স্থান থেকে বাঘ চলে গেলেও গণনার সময়ে অন্য কোন স্থান থেকে সেখানে আসার সম্ভাবনা সমানভাবেই থেকে যায়। তাই সেদিক থেকে গণনাটি ত্রুটিপূর্ণ বলা যায় না।

গণনাকারীরা বাঘের পায়ের ছাপ ও অন্যান্য তথ্যাদি সংগ্রহ করে গণনার সময় উত্তীর্ণ হলে মুখ্য গণনাকারীর কাছে জমা দিয়ে দেয়। তখন মুখ্য গণনাকারী বাঘের পায়ের ছাপগুলো ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখেন একই বাঘের পায়ের ছাপ নেওয়া হয়েছে কি না ও পরিসংখ্যানলিপিতে অন্যান্য তথ্যের সঙ্গে মাটির প্রকৃতির বর্ণনাও থাকে—যাতে বোঝা হয় মাটিটি শক্ত, নরম, এঁটেল বা অন্য কোনও প্রকার কিনা। এভাবে ভাল ভাবে পরীক্ষা করার পর মুখ্য গণনাকারী কোন বিশেষ বনে কতকগুলি বাঘ আছে সেটা সম্পর্কে পরিসংখ্যান ভিত্তিক নজির দিয়ে থাকেন। এরূপ গণনা বলাবাহুল্য ত্রুটিহীন হওয়া সম্ভব নয়। তবে গণনাকারীরা যদি উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত হন ও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে কাজটি করেন তবে বাঘের সুমারী বহুলাংশে ত্রুটিহীন হওয়াও অসম্ভব নয়।

বাঘের গণনা সম্বন্ধে যত সহজভাবে বলা হল ব্যাপারটা মোটেই ততটা সহজ নয়। কারণ গণনাকারীদের নিরাপত্তার দিকটা প্রধান বিবেচ্য বিষয়। তাই কোনও বনের প্রতিটি অঞ্চলে স্বাভাবিক কারণেই প্রতিটি গণনাকারীর পক্ষে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। গণনার পূর্বে তাই ঠিক করে নেওয়া হয় কোন্ গণনাকারী কোন্ কোন্ অঞ্চলে যাবেন ও কিভাবে যাবেন। বনের বিস্তার ও অবস্থানের উপরে যাওয়ার প্রশ্নগুলোকে বিবেচনা করা হয়। কোথাও হাতির পিঠে, কোথাও উটের পিঠে, কোথাও বা ডিঙি নৌকো করে গণনাকারীরা গিয়ে গিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সংগ্রহ করে থাকেন। সুন্দরবন অঞ্চলে তো আবার মানুষখেকো বাঘও রয়েছে। তাই সাবধানতা এখানে বিশেষভাবে প্রয়োজন। সেইজন্য এ বনে ভাটার সময় যখন স্থলভাগের ব্যপ্তি বেশি হয়, তখনই এই কাজ সেরে নেওয়া দরকার। বনাঞ্চলগুলোকে বিভিন্ন দ্বীপে ভাগ করে নেওয়া হয়।

ধরে নেওয়া হয়, গণনার সময় বাঘ অন্তত একবার জলের ধারে আসবেই। এই ধারণা বহুলাংশেই সঠিক বলে দেখা গেছে।

গণনার কাজ কঠিন—আর গণনা যখন বাঘকে ঘিরে, তখন তো কথাই নেই। তবে কোনও কাজই অসম্ভব হয় না, যদি গণনাকারীর সঠিক কর্তব্যনিষ্ঠা থাকে ও গণনার কৃত-কৌশল যদি আয়ত্তে থাকে। বলাবাহুল্য, ব্যাঘ্র প্রকল্পের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে সঠিক ব্যাঘ্রগণনার উপর। তাই বোধহয় এর কোনও সহজতর বিকল্প নেই। আর ব্যাঘ্রপ্রকল্প তো প্রকৃতি সংরক্ষণমূলক প্রকল্প, যার উপর মানুষও বহুলাংশে নির্ভরশীল।

ভারতের ব্যাঘ্র প্রকল্প

জিম করবেট বলেছিলেন, "A tiger is a large-hearted gentleman with boundless courage and that when he is exterminated, as exterminated he will be unless public opinion rallies to his support; India will be the poorer by having lost the finest of her fauna." জিম করবেটের ভবিষ্যদ্বাণী দু দশক যেতে না যেতেই অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। বাঘের সংখ্যা দ্রুতভাবে কমে যাওয়ায় বিশ্বজুড়ে চিন্তাভাবনা শুরু হল ও ব্যাঘ্র প্রজাতিকে নিশ্চিত অবক্ষয় থেকে বাঁচানোর বিশেষ প্রকল্প তৈরী হল—যারই নাম ব্যাঘ্র প্রকল্প।

বাঘ প্রাণীটি পৃথিবীর আপামর জনসাধারণের কাছে শৌর্য, বীর্য, সাহসিকতা, শ্রদ্ধা এবং ভীতির সংমিশ্রণে নির্মিত ভীষণ সুন্দর ও অভিনব এক অভিজ্ঞতা। সিন্ধু উপত্যকার মহেঞ্জোদড়ো থেকে সবচেয়ে পুরাতন যে মোহর ও তার ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া গেছে [খৃঃ পূঃ ২৫০০] তাতে বাঘের চিত্র খোদাই করা আছে। কোরিয়া দেশীয়রা বাঘকে প্রাণিজগতের রাজ সিংহাসনে বসিয়েছেন। সাইবেরিয়ার জনগণের সংস্কৃতিতে বাঘ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। চীনের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে বাঘের সম্পর্কও অতি প্রাচীন—তাদের শিল্পে ও চিত্রাবলীতে বাঘ বিশেষরূপে হাজির হয়েছে। তাদের দেশের 'ম্যুরাল' চিত্রগুলি এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতেও এই প্রাণীটির এক বিশিষ্ট স্থান রয়েছে।

ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহীশূর রাজ্যের শাসক টিপু সুলতান বাঘ প্রাণীটির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। টিপু

সুলতান নাকি বলতেন যে তিনি মেষশাবক হয়ে দু'শ বছর বাঁচার থেকে বাঘ হয়ে দু-বছর বেঁচে থাকতে চান। টিপু সুলতানের ব্যবহৃত সমস্ত সামগ্রীতে তাই বাঘের প্রতীক স্থান পেয়েছে—তাঁর সিংহাসন, তরবারি, পোশাক-পরিচ্ছদ, রুমাল, বন্দুক প্রভৃতিতে বাঘের প্রতীক লক্ষণীয়। তাঁর ব্যানারে লেখা থাকত "বাঘই ভগবান"।

আমরা মানুষেরা এই প্রাণীকুলের আহার, বাসস্থান প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় উপাদানগুলির বিষয়ে চরম অবহেলার পরিচয় দিয়েছি ও নিজেদের খেয়ালখুশি মেটাতে নির্বিচারে এদের শিকার করেছি। সত্যিই পাঁচ হাজার বছর ধরে মানুষ বাঘ মেরেছে। বড় বড় শিকারীদের মধ্যে ব্যাঘ্রহত্যার অশুভ প্রতিযোগিতা এ প্রাণীটিকে ক্রমশই কোণঠাসা করছিল। রাজা-মহারাজা, উর্ধ্বতন সামরিক ও অসামরিক রাজ-কর্মচারি এ অশুভ প্রতিযোগিতার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। সে সময় বাঘ শিকার ছিল সামাজিক আভিজাত্যের মাপকাঠি। উদয়পুরের মহারাজ অন্তত এক হাজার বাঘ শিকার করেছেন, সুরগুজার মহারাজা নিজেই এক হাজার পঞ্চাশটি বাঘ শিকার করেছেন বলে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন। ভারতবর্ষের প্রায় সকল রাজা-মহারাজাই তাঁদের দশ থেকে বারো বছর বয়সের মধ্যে প্রথম বাঘ শিকার করেছেন বলে জানা যায় ও এ শিকার বৃদ্ধ বয়স অবধি নিরন্তর চলেছে। এর ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। ১৯২০ সালে ভারতে যেখানে প্রায় ৪০ হাজার বাঘ ছিল বলে জানা গিয়েছিল, সে সংখ্যা ১৯৪০ সালে ৩০ হাজার। ১৯৬০ সালে ১৫ হাজার ও অবশেষে ১৯৭২ সালে মাত্র ১৮০০। অবশ্য ১৯৭২ সালেই প্রথম ভারতবর্ষে বিজ্ঞানভিত্তিক বাঘের গণনা শুরু হয়েছিল। তার পূর্ববর্তী বছরগুলোর সংখ্যাতত্ত্ব খানিকটা অনুমাননির্ভর। তাই বিশ্বজুড়ে শুরু হল বন্যপ্রাণী সংরক্ষণমূলক আন্দোলন—বাঘকে বাঁচিয়ে তোলার নতুন সংগ্রাম। ভারতবর্ষের উপরে বিশেষ দায়িত্ব এসে পড়ল কারণ, বিশ্ব ব্যাঘ্র মানচিত্রে ভারতের স্থান শীর্ষে। বাঘের বিভিন্ন প্রজাতি পৃথিবীজুড়ে রয়েছে ও এ সকল প্রজাতির আনুমানিক পরিসংখ্যানও অত্যন্ত উদ্বেগজনক: চীন দেশীয় বাঘ : ৪০ ; সুমাত্রান বাঘ : ৬৫০ ; ইন্দোচীন বাঘ : ৭৫০ (প্রায়); জাভাদেশীয় বাঘ : ৫ থেকে ১০ ; উশুরি বাঘ : ৯০০ (সাইবেরিয়ার বাঘ অন্তর্ভুক্ত) ; কাস্পিয়ান বাঘ : বিলুপ্ত ; ভারতীয় বাঘ : ৪০০৫; বাংলাদেশ ও নেপাল বাঘ : ৬৬০ ; বার্মার বাঘ : ৭৫০ ; বালি দেশীয় বাঘ : ৩।

বাঘের সংখ্যার ক্রমাবনতির একমাত্র কারণ অবশ্য বাঘ শিকার নয়, বাঘের আবাসস্থল কমে যাওয়া। স্বাভাবিক শিকার প্রাণীর সংখ্যা হ্রাস ও সব মিলে

প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় না থাকাই হচ্ছে বাঘের সংখ্যা হ্রাসের কারণ। তাই প্রকৃতিবিদ, বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সিদ্ধান্ত নিলেন যে বাঘকে বাঁচাতে গেলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে হবে। অবশেষে তৈরী হল 'ব্যাঘ্র প্রকল্প'—দ্রুত ক্ষয়িষ্ণু ব্যাঘ্র প্রজাতিকে কালের করাল গ্রাস থেকে উদ্ধার করার সর্বাত্মক প্রয়াস নিয়ে। ফলও পাওয়া গেল। ১৯৮৪ সালে ভারতবর্ষে বাঘের সংখ্যা সুমার অনুযায়ী পাওয়া গেল ৪০০৫।

জীববিজ্ঞানরূপী পিরামিডের শীর্ষবিন্দুতে রয়েছে বাঘ। তাই বাঘকে বাঁচানোর মধ্য দিয়ে বাঘ যে সব প্রাণী ও অন্যান্য প্রাণিজগতের উপর নির্ভরশীল তাদেরও সুষ্ঠ সংরক্ষণ সংঘটিত হবে। অর্থাৎ অরণ্যের উদ্ভিদ ও অপরাপর প্রাণিজগৎ নিয়ে সৃষ্ট এক বিরাট অথচ জটিল সুশৃঙ্খল প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায়কারী ব্যবস্থার মধ্যেই এই ব্যাঘ্র প্রকল্পের সাফল্য নির্ভর করছে। প্রকৃতিতে প্রতিটি প্রাণী অন্যান্য সকল প্রাণীর সঙ্গে সুশৃঙ্খলভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাই কোনও একটি প্রাণীর সংখ্যা কমে যাওয়ার ফল সামগ্রিকভাবে ভারসাম্যে ব্যাঘাত ঘটায়—যার ফলে মানুষ হয় ক্ষতিগ্রস্ত। তাই 'ব্যাঘ্র প্রকল্প' কেবলমাত্র একটি ক্ষয়িষ্ণু প্রজাতির সংরক্ষণ নয়—এ প্রকল্পের সাফল্য সামগ্রিকভাবে মানুষেরই কল্যাণ ডেকে আনবে।

'ব্যাঘ্র প্রকল্প' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে একটি ছোট ঘটনার কথা মনে আসছে। ১৯৭৬ সালের ঘটনা। আমি তখন সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের অধিকর্তা। বাঘের সংরক্ষণের কথা প্রচার করে বেড়াচ্ছি। একদিন আমার এক বন্ধু কথায় কথায় তাঁর এক ছাত্রের কথা আমায় বললেন। ছাত্রটি ইংলিশ মিডিয়ম স্কুলে পড়ে। কোন একদিন ক্লাসে আমার বন্ধু শিক্ষক ছাত্রটিকে 'Project Tiger' ব্যাখ্যা করতে বলেছিলেন। ছাত্রটি একটু ইতস্তত করে বলে ফেলল, "Project Tiger is a fast moving jeep which runs with speed through the streets of Calcutta" কথাটা শুনে আমি হেসে ফেললাম। কারণ, ব্যাঘ্র প্রকল্পের জিপটির সামনে বেশ বড় বড় করে 'Project Tiger' কথাটি লেখা ছিল। তখন ওই ছাত্রটি কখনও হয়ত জিপটিকে কলকাতায় দেখে ফেলেছিল।

ভারতবর্ষে এখন পর্যন্ত ষোলটি ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে 'ব্যাঘ্র প্রকল্প' চালু হয়েছে। প্রকল্প অঞ্চলগুলি ও তাদের মোট আয়তন নিচে দেওয়া হল :

ব্যাঘ্র প্রকল্পের নাম	মোট আয়তন (বর্গ কিঃমিঃ)	কোর আয়তন (বর্গ কিঃমিঃ)
(১) বান্দিপুর (কর্ণাটক)	৬৯০	৩৩৫
(২) করবেট (উত্তরপ্রদেশ)	৫২০	৩২০
(৩) কানহা (মধ্যপ্রদেশ)	১৯৪৫	৯৪০
(৪) মানস (অসম)	২৮৪০	৩৯১
(৫) মেলঘাট (মহারাষ্ট্র)	১৫৭১	৩১১
(৬) পালামৌ (বিহার)	৯৩০	২০০
(৭) রণথম্বোর (রাজস্থান)	৩৯২	১৬৭
(৮) সিমলিপাল (ওড়িশা)	২৭৫০	৩০০
(৯) সুন্দরবন (পশ্চিমবঙ্গ)	২৫৮৫	১৩৩০
(১০) পেরিয়ার (কেরালা)	৭৭৭	৩৫০
(১১) সরিস্‌কা (রাজস্থান)	৮০০	৪৯৮
(১২) বক্‌সা (পশ্চিমবঙ্গ)	৭৪৫	৩১৩
(১৩) ইন্দ্রাবতী (মধ্যপ্রদেশ)	২৭৯৯	১২৫৮
(১৪) নাগার্জুন সাগর (অন্ধ্রপ্রদেশ)	৩৫৬০	১২০০
(১৫) নামধাপা (অরুণাচলপ্রদেশ)	১৮০৮	৬৯৫
মোট	২৪,৭১২	৮৬০৮

(নবতম 'ব্যাঘ্রপ্রকল্প' দুধওয়া বাদ দিয়ে)

পনেরোটি ব্যাঘ্র প্রকল্প স্থাপিত হওয়ার পরে যোলতম প্রকল্প হিসেবে সংযোজিত হয়েছে দুধওয়া ব্যাঘ্র প্রকল্প (উত্তরপ্রদেশ)। এ প্রকল্পের মোট আয়তন ৪৯০ বর্গ কিলোমিটার।

পৃথিবীর বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ মানচিত্রে ভারতবর্ষের ভূমিকা অনন্য। কারণ পৃথিবীর যে স্বল্পসংখ্যক দেশ তাদের সংবিধানে বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কথা অন্তর্ভুক্ত করেছে ভারত তাদের একটি। শুধু তাই নয়, আজ ভারতবর্ষের এক লক্ষ বর্গ কিলোমিটার বনাঞ্চল বন্যপ্রাণীর জন্য বিশেষভাবে সংরক্ষিত।

৫৩টি ন্যাশনাল পার্ক ও ২৪৭টি অভয়ারণ্য নিয়ে বন্যপ্রাণী সংরক্ষিত এলাকা মোট ভৌগোলিক আয়তনের শতকরা ৩ ভাগ ও মোট বনের পরিমাণের শতকরা ১২ ভাগ রয়েছে ভারতবর্ষে। ব্যাঘ্র প্রকল্পে কোর এরিয়ার অর্থ হচ্ছে যে এ

বনাঞ্চল কেবলমাত্র বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য নিয়োজিত ও এরূপ বনাঞ্চলে মানুষের ভ্রমণ ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ।

হিমালয়ের বরফ-আচ্ছাদিত পর্বতমালা, থরের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত মরুভূমি ও সিংহল দ্বীপ ব্যতিরেকে ভারত উপমহাদেশের সর্বত্রই বাঘের অবস্থান অব্যাহত ছিল। ভারতবর্ষের মধ্যে হরিয়ানার জঙ্গলে, রাজস্থান ও গুজরাটের বনভূমিতে বাঘ সগর্বে উপস্থিত। দক্ষিণ ভারতের কর্নাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু ও কেরালাতে এই প্রাণীটি বসবাস করছে। বিহার, ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশের বনভূমি বাঘের একান্ত প্রিয় আবাসস্থল। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন ও উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলও বাঘের অতি প্রিয় ও মনোরম আবাসক্ষেত্র। উত্তরখণ্ডের চিরসবুজ ও অন্যান্য বনাঞ্চল বাঘের উপযুক্ত আবাসরূপে পরিচিত। পূর্ব থেকে পশ্চিমের গাঙ্গেয় উপত্যকা ও হিমালয়ের পাদদেশ জুড়ে যে বিস্তৃত বনাঞ্চল রয়েছে তা ভারতবর্ষের বাঘের সবচেয়ে পরিচিত বাসস্থান হিসেবে চিহ্নিত। তাই ব্যাঘ্র প্রকল্প অঞ্চলগুলি নির্বাচনের ক্ষেত্রে বনের ধরন, বিস্তার ও বন্যপ্রাণী টিকে থাকার ঐতিহ্য প্রভৃতি বিষয়গুলির উপর বিবেচনা করা হয়েছে যাতে সম্ভাবনাপূর্ণ প্রতিনিধিত্বমূলক বনভূমি অঞ্চল ব্যাঘ্র প্রকল্পের আওতায় আসে।

রণথম্বোর

ঐতিহাসিক কৌতূহল, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বন ও বন্যপ্রাণীর রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ও আলোকচিত্রশিল্পীদের স্বপ্নময় অনুভূতি—এর সব কিছুই এক জায়গায় পেতে হলে রণথম্বোর ব্যাঘ্র প্রকল্পের কথা ভাবা যেতে পারে। বাঘ দেখা ও বাঘের ছবি সংগ্রহ করার জন্য এর থেকে সহজতর অরণ্য বুঝি ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয়টি নেই। ১৯৫৭ সালে অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষিত রাজস্থানের রণথম্বোর ব্যাঘ্র প্রকল্পের আওতায় আসে ১৯৭৪ সালে ও ন্যাশনাল পার্ক হিসেবে ঘোষিত হয় ১৯৮১ সালে। মূলত ড্রাই ডেসিডুয়াস ফরেস্ট বা ঝরা পাতার শুষ্ক বনাঞ্চল রণথম্বোরের বৈশিষ্ট্য। ঋতু বদলের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার বনও রং বদলায়। বন্যপ্রাণীদের স্বভাব-বৈশিষ্ট্যেও আসে পরিবর্তন। ১৯৭২ সালে এ বনাঞ্চলে বাঘের সংখ্যা ছিল ১৪ কিন্তু ১৯৮৬-তে তা দাঁড়িয়েছে ৪০-এ। প্রকল্প কর্মীদের চেষ্টায় প্রায় ১৬টি প্রকল্প-মধ্যবর্তী গ্রাম, বহু গবাদি পশু প্রকল্পের বাইরে সরে গেছে যার ফলে বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কাজ অনেক সহজ হয়েছে। এ বনে বাঘ ছাড়াও বেশ কয়েকটি বিপন্ন বন্যপ্রাণী প্রজাতি রয়েছে যথা লেপার্ড, হায়েনা, জংলী ক্যাট, প্যান্থার, স্লথ বিয়ার, সম্বর, চিতল,

হরিণ, নীলগাই, বুনো শুয়োর ও বিভিন্ন রকমের পাখি। 'জোগী মহলের' নিশ্চিন্ত, নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে বন ও বন্যপ্রাণীর সৌন্দর্য উপভোগ ও বিস্মৃত ইতিহাসের স্মৃতি রোমন্থন করার এত সুন্দর পরিবেশ আজ ভারতবর্ষে খুব কমই আছে। পদম তালাও, রাজবাগ তালাও ও মিলক তালাও—এ তিনটি জলাশয় রণথম্বোরকে অনেক বেশী আকর্ষণীয় করেছে। জলাশয়ে কুমীরের উপস্থিতি পর্যটন রোমাঞ্চকে অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে।

দিল্লী থেকে মাত্র তিনশ কিলোমিটার দূরে প্রকৃতির এ অনুপম আকর্ষণ রণথম্বোর পর্যটন শিল্পকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে তেমনি পর্যটকদের দিয়েছে অনাবিল আনন্দ ও রোমাঞ্চ।

পেরিয়ার

কেরালা রাজ্যের একটি অতি জনপ্রিয় ব্যাঘ্র প্রকল্প হচ্ছে পেরিয়ার ব্যাঘ্র প্রকল্প। প্রায় একশ' বছর আগে একজন ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার কর্নেল পেনিচুইক পেরিয়ার নদীর উপরে বাঁধের পরিকল্পনা করেছিলেন। সে বাঁধটি কেরালা রাজ্যের পশ্চিমঘাট পর্বতমালার দুর্ভেদ্য বনের ভেতর দিয়ে চলে গেছে। ৭৭৭ বর্গকিলোমিটার বনাঞ্চল নিয়ে এ ব্যাঘ্র প্রকল্প যার মধ্যে কোর বনাঞ্চল হচ্ছে ৫৫ বর্গকিলোমিটার। আজ পেরিয়ার পৃথিবীর বন্যপ্রাণী পর্যটন মানচিত্রে বিশিষ্টতার দাবি করতে পারে। প্রতি বছর এখানে গড়ে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পর্যটক বন ও বন্যপ্রাণী প্রকৃতি উপভোগ করতে আসেন। মোটর লঞ্চ ও নৌকো ভ্রমণে পর্যটক বনের অনাবিল সৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গে বাঘ, গউর, হাতি, বুনোশুয়োর, বুনোকুকুর, শজারু, লায়ন টেইলড ম্যাকাক, নীলগিরি লাঙ্গুর, কমন লাঙ্গুর, বনেট ম্যাকাক, মালাবার স্কুইরেল ভোঁদড় ও বিভিন্ন পাখী দেখতে পান। বন্য হাতির ব্যবহার বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণের এত সুন্দর বনাঞ্চল অন্য কোন অভয়ারণ্যে আছে বলে মনে হয় না। সাম্প্রতিক ব্যাঘ্র সুমারী অনুযায়ী এ ব্যাঘ্র প্রকল্পে চল্লিশটি বাঘের সন্ধান মিলেছে। পেরিয়ার হ্রদের অন্য এক আকর্ষণ হচ্ছে মহশীর মাছ ও স্টার টরটয়েস। সমস্ত পর্যটনের ব্যবস্থা নৌকো ও মোটর লঞ্চ থেকে হয় বলে এ ব্যাঘ্র প্রকল্পের বনাঞ্চল পর্যটকদের প্রবেশে কলুষিত হবার সম্ভাবনা থাকে না।

প্রকল্প অঞ্চলে পর্যটনের সুবিধার জন্য পর্যটক নিবাস ও বন বিশ্রাম গৃহের সঙ্গে সঙ্গে বেশ কয়েকটি নজর মিনার বা ওয়াচ টাওয়ারের সুব্যবস্থা করেছেন প্রকল্প কর্তৃপক্ষ। প্রকৃতিকে সুন্দরভাবে দেখানোর কোন চেষ্টারই ত্রুটি খুঁজে পাওয়া যায় না। পেরিয়ার সুন্দর ও আকর্ষণীয় পর্যটকদের কাছে।

করবেট

দিল্লী থেকে মাত্র তিনশ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে হিমালয়ের পাদদেশে ভারতবর্ষের প্রথম ঘোষিত ন্যাশনাল পার্ক হচ্ছে করবেট—যেটি ১৯৭৩ সালের পয়লা এপ্রিল ব্যাঘ্র প্রকল্প পরিবারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রখ্যাত শিকারী প্রকৃতিবিদ্ জিম করবেটের নামেই এ বনাঞ্চলের নামকরণ। জিম করবেট এ বনাঞ্চল পরিবেশেই তার পৃথিবী বিখ্যাত বইগুলি রচনা করেছিলেন—'The Man-eaters of Kumaon', 'The Man-eating Leopard of Rudraprayag প্রভৃতিও 'With a camera in Tiger-Land', 'The Jungle in Sunlight and shadow' প্রভৃতি রচনাও করবেটকে সমৃদ্ধ করেছে। শেষের বই দুটি চ্যাম্পিয়নের রচনা।

করবেট ন্যাশনাল পার্কের ইতিহাস রোমাঞ্চে ভরা। বহু বছর আগে রামগঙ্গা নদীর তীরে বসবাস করছিলেন কোন শিল্পোন্নত মনুষ্য সম্প্রদায়—আজও যাঁদের সংস্কৃতির ছিন্নমূল দেখতে পাওয়া যায় এ নদীর তীরে—টেরাকোটা ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে। এ সম্প্রদায় বনের গভীরে বাস করছিলেন বন্যপ্রাণীদের সঙ্গে যুদ্ধ করেই। কিন্তু এর পরে ব্রিটিশরা এসে বন-ধ্বংসের লীলায় মেতে গেলেন। পরবর্তীকালে মেজর রামসে ও দু-জন বন বিভাগীয় আধিকারিক স্টিভেন্স ও স্মিফিসের প্রচেষ্টায় বনসংরক্ষণ শুরু হল। জিম করবেট তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হলেন। শুরু হল বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ। ফলশ্রুতি হিসেবে ভারতবর্ষের প্রথম ন্যাশনাল পার্ক তৈরী হল হাইলে ন্যাশনাল পার্ক নামে ২৫৬ বর্গকিলোমিটার বনাঞ্চলের উপরে তদানীন্তন গভর্নর স্যার ম্যালকম হাইলের নামানুসারে ১৯৩৬ সালের ৮ আগস্ট। এর পর ন্যাশনাল পার্কটি নতুন নাম নিল ১৯৫৭ সালে "করবেট ন্যাশনাল পার্ক" নামে। বর্তমান করবেট টাইগার রিজার্ভের মোট আয়তন ৫২০ বর্গকিলোমিটার। এছাড়া আরও ৩০০ বর্গকিলোমিটার বনাঞ্চল ব্যাঘ্র প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসার প্রচেষ্টা চলছে। করবেট প্রকল্প অঞ্চলটির উচ্চতার তারতম্য ৪০০ মিটার থেকে ১২১০ মিটারের মধ্যে। শিবালিক পর্বতমালার এ বনাঞ্চলে শাল, হালদু, রোহিণী, শিশু, খয়ের, বক্‌লী, চির প্রভৃতি বৃক্ষরাজির দেখা মেলে বিভিন্ন বনের পরিবেশে। ৫০টি স্তন্যপায়ী, ৫৪০টি পক্ষী প্রজাতি ও ২৫টি রেপটাইল প্রজাতি নিয়ে করবেট আজ ভারতবর্ষের ব্যাঘ্র প্রকল্পগুলির মধ্যমণি। বাঘের সংখ্যা ৪০ (১৯৭২) থেকে বেড়ে বর্তমানে ৯০টিতে (১৯৮৪) দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়া এ প্রকল্প অঞ্চলে, বিপন্ন বন্যপ্রাণী প্রজাতির মধ্যে রয়েছে লেপার্ড, লেপার্ড ক্যাট, জাঙ্গল ক্যাট, ফিসিং

ক্যাট, স্লথ বিয়ার, হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার, বুনো কুকুর ও বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী পাখি প্রজাতির আশ্চর্য সমারোহ ও ভোঁদড় প্রভৃতি।

পনেরোই নভেম্বর থেকে পনেরোই জুন বনাঞ্চলটি পর্যটকদের কাছে খোলা থাকে। বেশ কয়েকটি বনবিশ্রামাগার রয়েছে এ প্রকল্পে—রয়েছে পর্যটনের সুবিধার জন্য নজর মিনার, হাতি ও গাড়ি করে দর্শনের সুব্যবস্থা। বলা বাহুল্য করবেট ব্যাঘ্র প্রকল্প তাই পর্যটকদের কাছে অতি প্রিয় ও আকর্ষণীয়।

দুধওয়া

ব্যাঘ্র প্রকল্প পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য উত্তরপ্রদেশের দুধওয়া। ভারতবর্ষের বোধ করি সবচেয়ে মূল্যবান শাল জঙ্গলের ৪৯০ বর্গকিলোমিটার বনাঞ্চল এ ব্যাঘ্র প্রকল্পের আয়তন। অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষিত ১৯৬৫ সালে ও ন্যাশনাল পার্ক হিসেবে স্বীকৃত ১৯৭৭ সালে দুধওয়া বন-বন্যপ্রাণী-মানুষের নিরন্তর সংগ্রামের এক অতি সফল উদাহরণ। শিকারীর ধ্বংসলিপ্সা, পদাধিকারীদের রাজস্ব সংগ্রহের আগ্রহ ও সাধারণ মানুষের কাঠ ও কাঠজাত বনজদ্রব্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা কোন কিছুতেই ব্যাঘ্র প্রকল্পের নবজাত শিশুর জন্মলগ্নে ব্যাঘাত ঘটানো যায়নি। এর বোধ হয় অন্যতম কারণ মানুষেরই শুভবুদ্ধি ও চেতনার উন্মেষ। দুধওয়া ব্যাঘ্র প্রকল্প অঞ্চলে বহু বিপন্ন বন্যপ্রাণী প্রজাতির দেখা পাওয়া যায়—বাঘ ছাড়াও রয়েছে লেপার্ড, বুনো হাতি, স্লথ বিয়ার, সিভেট ক্যাট, ফিসিং ক্যাট, লেপার্ড ও জাঙ্গল ক্যাট ও সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বারাসিঙ্গা। বহু দেশী ও বিদেশী পাখি প্রজাতিতেও সমৃদ্ধ এ প্রকল্প।

অতিশয় বিপন্ন গণ্ডার প্রজাতি বাসস্থান খোঁজার পরীক্ষায় কাজিরাঙা থেকে দুটি পুরুষ ও পাঁচটি মেয়ে গণ্ডার স্থানান্তরিত হয়েছে দুধওয়ার নতুন বাসস্থানে ১৯৮০ সালে। সুখের কথা যে এ বন্যপ্রাণীরা তাদের নতুন বাসস্থানে ভালভাবেই নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে।

পর্যটনের নানা রকম ব্যবস্থা রয়েছে এ প্রকল্পে। দুধওয়া, সাথিয়ানার বনবিশ্রামাগার, টাইগার হেভেনের পর্যটক ক্যাম্প ও বিভিন্ন নজর মিনার পর্যটকদের প্রকৃতি ও বন-বন্যপ্রাণী উপভোগের সহায়তা দিয়েছে।

পালামৌ

১৬৬০ সালে দায়ুদ খান সৈন্যসামন্ত সহ পালামৌর বনে কামানের গোলা নিয়ে যাবার জন্য বন কেটে রাস্তা তৈরী করেছিলেন—উদ্দেশ্যটা ছিল যুদ্ধের

প্রস্তুতি। পালামৌ আজও যুদ্ধে লিপ্ত। তবে যুদ্ধের পটভূমি ও উদ্দেশ্য ভিন্ন। বন ও বন্যপ্রাণী প্রকৃতিকে বাঁচাতে পালামৌ এখন যুদ্ধ করছে হিংস্র শিকারী ও মানুষের সীমাহীন লোভের বিরুদ্ধে। সংগ্রামে সে জয়ীও হয়েছে। ব্যাঘ্র প্রকল্প পরিবারের প্রথম নটি প্রকল্পের মধ্যে পালামৌ একটি। গ্রীষ্মে ৪৪° সেন্টিগ্রেড ও শীতে ৪° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার তারতম্য নিয়ে এ বনাঞ্চলে তিনটি প্রধান ঋতুর দেখা মেলে—শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা।

পর্যটনের স্বর্গভূমি এ বনাঞ্চলে আজ পর্যটকরা বাঘ ছাড়াও দেখতে পান—বুনো হাতি, লেপার্ড, সম্বর, বাইসন, চিতল হরিণ, বুনো শুয়োর ও বিভিন্ন পাখি প্রজাতি। পৃথিবীর প্রথম ব্যাঘ্র সুমারী এখানেই হয়েছে ১৯৩২ সালে।

বন বিশ্রামাগার, পর্যটন নিবাস, নজর মিনার, পোষা হাতি, গাড়ির ব্যবস্থা—কি নেই এ প্রকল্প অঞ্চলে।

কান্‌হা

প্রথম যে নটি বনাঞ্চল ব্যাঘ্র প্রকল্পের সরকারী স্বীকৃতি পেয়েছে মধ্যপ্রদেশের কান্‌হা তাদের অন্যতম। কান্‌হা ব্যাঘ্র প্রকল্পের মোট আয়তন ১৯৪৫ বর্গকিলোমিটার। মধ্যপ্রদেশের সাতপুরা ও বিন্ধ্য পর্বতমালার মধ্যবর্তী এ বনাঞ্চল বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সাফল্যের শীর্ষে। বিপন্ন বন্যপ্রাণী বৈচিত্র্যে কান্‌হা অনন্য—বাঘ ছাড়াও রয়েছে লেপার্ড, বুনো কুকুর, চৌশিঙ্গা, বারাশিঙ্গা, সম্বর, চিতল হরিণ, বার্কিং ডিয়ার, বুনো শুয়োর ও বহু প্রজাতির পাখি। ১৯৭৩ সালের ব্যাঘ্র সুমারী অনুযায়ী বাঘের সংখ্যা ছিল ৪৩—আজ সেটা বেড়ে ১০০-এর কাছাকাছি। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের স্বার্থে সতেরোটি গ্রাম প্রকল্পের অভ্যন্তর থেকে সরিয়ে এনে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়েছে। শাল, বাঁশের বিস্তীর্ণ সবুজের পাশাপাশি ঘাসের ঘন বন কান্‌হা বনাঞ্চলকে বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে—দিয়েছে এ বনের গবাদি পশু বাসিন্দাদের যথোপযুক্ত আহারের সংস্থান। খাদক ও খাদ্য প্রাণীর অনুপাতের ভারসাম্য তাই স্বাভাবিক নিয়মেই এনেছে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের শৃঙ্খলা।

দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের অতি প্রিয় কান্‌হার এ বনাঞ্চল। পর্যটনের ব্যবস্থাও ত্রুটিহীন—পর্যটন নিবাস, বন বিশ্রামাগার, নজর মিনার সবই আছে এ ব্যাঘ্র প্রকল্পে।

নামধাপা

ব্যাঘ্র প্রকল্প পরিবারের নতুন সংযোজন নামধাপা। ১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে নামধাপা এ বৃহৎ পরিবারের সদস্য হিসেবে যোগ দিয়েছে। নামধাপা নদীর নামেই প্রকল্পের নাম। নদীর জন্মস্থল 'ধাপাবুম' নামে চার হাজার পাঁচশ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট একটি পাহাড়ের চূড়া—যেটি এ প্রকল্পের উচ্চতম স্থান বলে চিহ্নিত। প্রকল্পের মোট আয়তন ১৮০৮ বর্গকিলোমিটার ও এটি অরুণাচল প্রদেশের তিরাপ জিলায় অবস্থিত।

নামধাপা পৃথিবীর ন্যাশনাল পার্ক মানচিত্রে অনন্য কারণ পৃথিবীর অন্য কোন ন্যাশনাল পার্কের উচ্চতার তারতম্য নামধাপার মত এত বেশী নয়—দুশ' মিটার (প্রায় সমুদ্রতল) থেকে চার হাজার পাঁচশ' মিটার। তাই স্বাভাবিক কারণেই বন ও বন্যপ্রাণী সমৃদ্ধির তারতম্যেও অনন্য পৃথিবীর অন্যান্য ন্যাশনাল পার্কগুলির মধ্যে। নোয়াডেহিং নামে একটি নদী নামধাপা ন্যাশনাল পার্ক ভেদ করে বয়ে চলেছে অন্যান্য কয়েকটি শাখা নদীর সঙ্গে যথা ডেবান, নামধাপা, মপেন ও বার্মা নালা। যদি কোনও পর্যটকের ভারতবর্ষের আদিম অরণ্য সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার ইচ্ছা থাকে তবে তিনি নামধাপা ব্যাঘ্র প্রকল্প বনাঞ্চলে চলে আসতে পারেন। ট্রপিকাল ওয়েট এভারগ্রীন, ড্রাই মিক্সড ডেসিডুয়াস ও টেমপারেট আলপাইন বন সবগুলিই রয়েছে এ ব্যাঘ্র প্রকল্প অঞ্চলে—যার তুলনা পাওয়া কঠিন। উদ্ভিদ ও প্রাণী বিজ্ঞানী স্বপ্নের স্বর্গ এ নামধাপা। উদ্ভিদ ও প্রাণিবিদ্যার জীবন্ত ল্যাবরেটরি। নামধাপার বিপন্ন বন্যপ্রাণী বৈচিত্র্যের মধ্যে রয়েছে, চারটি বিড়াল জাতীয় প্রাণী—বাঘ, লেপার্ড, স্নো-লেপার্ড ও ক্লাউডেড লেপার্ড। তা ছাড়া রয়েছে হুলক গিবন, হাতি, বাইসন, মলিয়ান সম্বর, হগ ডিয়ার, বার্কিং ডিয়ার, গোরাল, মিশমি টাকিন, হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার, লেসার পাণ্ডা, স্লো-লরিস, পাঁচটি বানর প্রজাতি, ছটি স্কুইরেল প্রজাতি ও বহু বিচিত্র পাখি প্রজাতি।

নামধাপা বনাঞ্চলের জীববিদ্যা রূপরহস্য এখনও পুরোপুরি উদ্ঘাটিত হয়নি। তাই বিভিন্ন দেশ-বিদেশের জীববিজ্ঞানীরা প্রকৃতির এ গবেষণাগারে আসেন রহস্য উন্মোচনের তাগিদে। পর্যটন ব্যবস্থা এখনও পুরোপুরি ও নিখুঁত করা সম্ভব হয়নি—যদিও এখানে বন বিশ্রামাগার ও বেশ কিছু পর্যটনের উপযোগী নজর মিনার রয়েছে।

বান্দিপুর

কর্নাটক রাজ্যের বান্দিপূর ব্যাঘ্র প্রকল্প হিসেবে সরকারীভাবে স্বীকৃত হয় ১৯৭৩ সালে অন্য আটটি প্রকল্পের সঙ্গে। বাঘের সংখ্যা ২৭ (১৯৭৮) থেকে বেড়ে ৫৩-তে (১৯৮৬) দাঁড়িয়েছে। পাতা-ঝরা শুষ্ক বন বা ড্রাই ডেসিডুয়াস ফরেস্ট বান্দিপুর বনের প্রধান বৈচিত্র্য। বিপন্ন বন্যপ্রাণী প্রজাতিদের মধ্যে বাঘ ছাড়াও রয়েছে লেপার্ড, বন্য কুকুর বা ঢোল, বাইসন, হাতি, মাউস ডিয়ার, চিতল হরিণ প্রভৃতি। দেশী ও বিদেশী পাখির সমারোহ এ প্রকল্পের বৈচিত্র্যের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

প্রায় একশ বছর আগে একজন ব্রিটিশ নাগরিক জি পি স্যানডারসন এ বনাঞ্চলেই হাতি ধরেছিলেন খেদার মাধ্যমে। তারপর থেকে হাতির খেদা প্রচলিত পদ্ধতিরূপে অন্যান্য অঞ্চলেও করা হয়েছে। রিণ্ডারপেস্ট নামে এক মারাত্মক অসুখে শত শত বাইসনের মৃত্যু হয় এ বনাঞ্চলে ১৯৬৮ সালে। তারপরে অবশ্য বনকর্মীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বাইসনের সংখ্যা আবার বাড়তে থাকে।

বান্দিপুর পর্যটকদের কাছে অতি প্রিয়—তাই প্রতি বছর এ বনাঞ্চলে কম করেও অন্তত পঞ্চাশ হাজার পর্যটক আসেন প্রাকৃতিক বন্য বৈচিত্র্য উপভোগের উদ্দেশ্যে। পর্যটন ব্যবস্থায় বান্দিপুর অন্য সকল প্রকল্পকে ছাড়িয়ে যেতে বসেছে। সুন্দর বন বিশ্রামাগার, হাতি ও গাড়িতে করে দেখার সুশৃঙ্খল বন্দোবস্ত। নজর মিনারের সুযোগ সবই পর্যটকদের দারুণ আকর্ষণ করে। নুগু, মোয়ার ও কাবিনী নদী বান্দিপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে অনেকাংশে বাড়িয়েছে। এখানকার নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া পর্যটন শিল্পকে করেছে সমৃদ্ধ---পর্যটকদেরও দিয়েছে বাড়তি সুবিধা।

মেলঘাট

'মেলঘাট' কথাটির অর্থ 'পাহাড়ের মিলন'। মেলঘাট প্রথম নটি ঘোষিত ব্যাঘ্র প্রকল্পের একটি। গভীর ঘন সেগুন-বাঁশ প্রভৃতি বৃক্ষ প্রজাতি নিয়ে আবিষ্ট মেলঘাট ছোট-বড় নালায় খণ্ডিত হয়েও পাহাড়ে পাহাড়ে মিলন ঘটিয়েছে। প্রকৃতি অকৃপণ হস্তে মেলঘাটকে যেন সৌন্দর্য উজাড় করে দিয়েছে। প্রকৃতিবিজ্ঞানী বার্টন মেলঘাটের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর 'Sport and Wild life in the Deccan' গ্রন্থে বর্ণনা দিয়েছেন "Much like an earthly

paradise as anything can be in this unsatisfactory world."

মহারাষ্ট্রের অমরাবতী জিলায় সাতপুরা-গাভিলগড় পাহাড়ের ঘন সুবিন্যস্ত বন নিয়েই গড়ে উঠেছে আজকের মেলঘাট ব্যাঘ্র প্রকল্প। পাহাড় ও উপত্যকার সারিবদ্ধ প্রদর্শনী বনাঞ্চলের সৌন্দর্যকে অনেকাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে। তাপ্তি, সিপনা, ডোলার নদী এ ব্যাঘ্র প্রকল্প অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণ করছে। অন্য সকল ব্যাঘ্র প্রকল্পের মত এখানেও মানুষ ও প্রকৃতির সংঘাত চলছে নিরন্তর। বনাঞ্চলের দুর্গম অবস্থানের জন্য প্রকল্প কর্মীদের ঘোড়া ব্যবহার করতে হচ্ছে খবরদারির কাজে। গউলী উপজাতীয় মানুষের গ্রাম রয়েছে প্রকল্পের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ও প্রকল্প কর্মীদের সঙ্গে তাই প্রায়শই প্রকৃতি সংরক্ষণের কাজে এ উপজাতীয় মানুষদের সংঘাত চলছে। কিন্তু বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের তাগিদে বেশ কিছু গ্রামকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রকল্পের অভ্যন্তর থেকে।

বিপন্ন বন্যপ্রাণী প্রজাতিদের মধ্যে বাঘ ছাড়া লেপার্ড, হাতি, বুনো কুকুর, সিভেট ক্যাট, সজারু, বার্কিং ডিয়ার, বুনো শুয়োর, সম্বর, স্লথ বিয়ার ও বিভিন্ন পাখি প্রজাতি মেলঘাটকে সমৃদ্ধ করেছে।

পর্যটন ব্যবস্থার উন্নতির উপরে ব্যাঘ্র প্রকল্প কর্তৃপক্ষ বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছেন। প্রকল্পের প্রত্যন্ত প্রদেশে রয়েছে বেশ কয়েকটি বন-বিশ্রামাগার—কোলকাজ, কোকটু ও অন্যান্য স্থানে। প্রকৃতি বিশ্লেষণ শিক্ষণ কেন্দ্রও স্থাপন করা হয়েছে পর্যটনের আকর্ষণে।

মানস

১৯২৮ সালে সংরক্ষণ বনভূমি হিসেবে যার উৎপত্তি ১৯৭৩ সালে ব্যাঘ্র প্রকল্প পরিবারে তার অন্তর্ভুক্তি। এ মানস ব্যাঘ্রপ্রকল্প আজ বিপন্ন বন্যপ্রাণী বৈচিত্র্যে ভারতবর্ষের বেশীর ভাগ অভয়ারণ্যকেই পিছনে ফেলে গেছে। গুয়াহাটি থেকে ট্রেনে বা গাড়িতে তিন ঘণ্টায় বরপেটা রোডে পৌঁছোনো যায়। বরপেটা রোডই প্রকল্পের হেড কোয়ার্টার। অবশ্য ট্রেনে চেপে সরাসরিও বরপেটা রোডে পৌঁছোনো যায়। বরপেটা রোড থেকে ৪১ কিলোমিটার গেলেই মাথানগুড়ি বন বিশ্রামাগার। বন্যপ্রাণী সম্পদে সমৃদ্ধ মানস ব্যাঘ্র প্রকল্পে কুড়িটির মত অতিশয় বিপন্ন বন্য প্রাণী রয়েছে—যেটি ভারতবর্ষের অন্য কোনও অভয়ারণ্যে নেই। বাঘ ছাড়াও এখানে রয়েছে হাতি, গণ্ডার, বুনো মোষ, গোল্ডেন লাঙ্গুর, হিসপিড হেয়ার, পিগমী হগ, ক্যাপ্‌ড লাঙ্গুর, আসামিজ ম্যাকাক,

স্লো-লরিস, হুলক গিবন, বার্কিং ডিয়ার, হগ ডিয়ার, সম্বর, সোয়াম্প ডিয়ার, বাইসন, স্লথ বিয়ার, ক্লাউডেড লেপার্ড প্রভৃতি। এ ছাড়া রয়েছে বহু বিচিত্র প্রজাতির পোকা-মাকড়। প্রজাপতি, রেপটাইল শ্রেণীর বন্যপ্রাণী। পাখি প্রজাতি বৈচিত্র্যেও মানস অনন্য।

মানস নদীর নামেই এ ব্যাঘ্র প্রকল্প। নদীটি ভারত ও ভুটানের মধ্যে সীমানা নির্ধারণ করছে। ২৮৪০ বর্গকিলোমিটার বনাঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠেছে প্রকৃতির এক অনবদ্য সৃষ্টি—মানস যার নাম। আসামের অন্য ন্যাশনাল পার্ক কাজিরাঙা যেরূপ পর্যটককে বন্যপ্রাণী দর্শনে সাধারণত কখনই বঞ্চিত করে না মানস কিন্তু সে ব্যাপারে এতটা উদার নয়। কিন্তু মানসের বন্যপ্রাণী উপভোগ যেন স্বর্গীয় শিহরনে পর্যটককে আন্দোলিত করে যা কোন ভাষায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। হিসপিড হেয়ার ও পিগমী হগ—এক সময় মনে করা হয়েছিল যে এরা পৃথিবীর বুক থেকেই নিঃশেষিত প্রায়। কিন্তু অত্যন্ত আশার কথা যে এ দুটি অতিশয় বিপন্ন বন্যপ্রাণী মানস ব্যাঘ্র প্রকল্পের সংরক্ষণ ব্যবস্থায় পর্যটকদের চোখেও ধরা পড়ছে।

পর্যটকদের কাছে মানস আজ অতি প্রিয়—সকলেই এক কথায় মানস ঘুরে আসতে চান। কিন্তু পর্যটন ব্যবস্থা এখনও সকলের ইচ্ছা পূরণে সহায়ক নয়। মে থেকে সেপ্টেম্বর মানসের দ্বার পর্যটকদের কাছে আপাতত বন্ধ। কিন্তু অন্য সময় অবারিত। সুখের কথা এই যে একটি নতুন প্রশস্ত পর্যটন নিবাস প্রকল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে তৈরী হচ্ছে। আশা করি, ভবিষ্যতে পর্যটকদের বহুদিনের স্বপ্ন মানস ভ্রমণ সফল হবে।

সরিস্কা

রাজস্থানের আরাবল্লী পর্বতমালায় যে কটি স্বল্পসংখ্যক বন এখনও তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে সরিস্কা তাদের মধ্যে একটি। আলওয়ার পূর্ববর্তী মহারাজা জয় সিংহের প্রিয় শিকার ক্ষেত্র সরিস্কা অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষিত হয় ১৯৫৫ সালে ও ১৯৭৯ সালে ব্যাঘ্র প্রকল্প পরিবারের উল্লেখযোগ্য সদস্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ধোক, খয়ের, টেন্দু, বের প্রভৃতি বৃক্ষরাজি নিয়ে সরিস্কাকে পাতাঝরা শুষ্ক বনভূমি বা ড্রাই ডেসিডুয়াস ফরেস্টের আওতায় ফেলা হয়। পৌরাণিক ইতিহাসের অমর সাক্ষীও সরিস্কা। এই সরিস্কা বনাঞ্চলেই রয়েছে কান্‌কওয়ারী দুর্গ যেখানে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারাকে বন্দী করেন ও পরে হত্যা করেন। পৌরাণিক নীলকান্ত

মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে সরিস্কার বনাঞ্চলে।

বিপন্ন বন্যপ্রাণী প্রজাতিতে সরিস্কা যথেষ্ট সমৃদ্ধ। বাঘ ছাড়াও রয়েছে প্যান্থার, জংলী বিড়াল, হায়েনা, কারাকাল, সম্বর, চিতল, নিলগাই, বুনো শুয়োর, শজারু প্রভৃতি। সিলিসের হ্রদে কুমীর পর্যটন আকর্ষণ বাড়িয়েছে। কালিঘাটি ও সালোপকার কৃত্রিম জলাশয় বন্যপ্রাণী প্রদর্শনে পর্যটকদের তৃপ্তি এনে দেয়। কারণ এ জলাশয়গুলির কাছে কিছু গুপ্ত স্থান থেকে পর্যটকরা বন্যপ্রাণী দেখে থাকেন। সূর্যাস্তের বেশ আগে থেকেই এ সকল স্থানে পর্যটকরা চলে যান ও রাতের অন্ধকারে সার্চ লাইট দিয়ে বন্যপ্রাণী দর্শন করেন। সরিস্কার পাখি প্রজাতির বৈচিত্র্যও পর্যটকদের আকর্ষণের কারণ। পর্যটকদের রাত্রিবাসের জন্য এখানে রয়েছে সুবন্দোবস্ত—বন বিশ্রামাগার ও পর্যটন নিবাস।

সিমলিপাল

১৯৭৬ সালে দু-জন বিদেশী প্রকৃতিবিদ্‌কে সঙ্গে নিয়ে প্রথম সিমলিপাল দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। সরাসরি চলে গেলাম জশীপুর—ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জিলায়। আমি তখন সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের অধিকর্তা। গিয়ে দেখলাম একটি ছোট বাংলো খানিকটা ক্যাম্পাস নিয়ে ও তার লোহার গেট বন্ধ ও বহু কৌতূহলী মানুষের ভিড় চারিদিকে। গেট খুলতে না খুলতেই দেখা গেল একটি পূর্ণবয়স্কা বাঘিনী আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে—পিছনে সিমলিপাল ব্যাঘ্র প্রকল্পের অধিকর্তা। হ্যাঁ, আমি খৈরী বাঘিনীর কথাই বলছি। বিদেশী প্রকৃতিবিদ্‌দের সঙ্গে সঙ্গে আমিও কিছু হতচকিত। এর কিছুক্ষণ পরে আমরা সিমলিপাল ব্যাঘ্র প্রকল্প নিয়ে তথ্য ও তত্ত্বগত আলোচনায় মেতে গেলাম। কিন্তু ব্যাপারটা বোধ হয় খৈরীর মনঃপূত নয়। খৈরীর তখন নাকি পালক পিতা ও ব্যাঘ্র প্রকল্পের অধিকর্তার কাছ থেকে আদর খাওয়ার সময়। অথবা ছোট মেয়ের বাবার ও বাবার বন্ধুদের কাছে নিজেকে জাহির করার ইচ্ছাও। বারে বারে খৈরী এসে পালক পিতা ও আমাদের কাছে হাজির হতে থাকল ও মুখ-কান ঘষতে লাগল আমাদের সমস্ত শরীরে। বলা বাহুল্য, আলোচনা আমাদের জমল না। তাই ঠিক করা গেল জশীপুর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া। যেতে যেতে নানা কথা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল ব্যাঘ্র প্রকল্পের অধিকর্তার সঙ্গে।

সিমলিপাল এক সময় ময়ূরভঞ্জ রাজার শিকার ক্ষেত্র ছিল ও সে কারণেই অন্যান্য মানুষের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিল। বনাঞ্চলটি যেহেতু কেবলমাত্র রাজ পরিবারের শিকার ক্ষেত্র তাই অন্যান্য মানুষের অত্যাচারের সুযোগ ঘটেনি

এখানে। তাই সিমলিপাল বনের প্রকৃতি খানিকটা কম বিকৃত। শালের ঘন জঙ্গলের পাশাপাশি ঘাসের বিস্তীর্ণ অঞ্চল দেখতে দেখতে আমরা চলেছি সিমলিপাল ভেদ করে। বনের ঘনত্ব, লতাপাতা গুল্মের সন্নিবিষ্ট উপস্থিতিতে দিনকে রাত মনে হচ্ছিল। শাল, চাঁপ, কদম, টার্মিনালিয়ার গভীর ঘনত্ব দেখতে দেখতে চলেছি ও সিমলিপালের কথা আলোচনা করছি। বন্যপ্রাণীদের পায়ের ছাপ মাঝে মাঝে পরীক্ষা করছি। ইতিমধ্যেই বাঘ, লেপার্ড, বুনো কুকুরের অস্তিত্ব টের পেয়েছি, তাদের পদচিহ্নে। অন্যান্য বিপন্ন বন্যপ্রাণী প্রজাতির মধ্যে রয়েছে মাউস ডিয়ার, জায়েন্ট স্কুইরেল, বার্কিং ডিয়ার, হাতি, গউর, চিতল, প্যাঙ্গোলীন প্রভৃতি। ১৯৫৭ সালে অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষিত সিমলিপাল ১৯৭৩ সালেই ব্যাঘ্র প্রকল্পের আওতায় আসে।

মানুষ ও প্রকৃতি সিমলিপালেও যুদ্ধরত। মানুষ তার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে প্রকৃতির ভাণ্ডার নিঃশেষ করতে চায় ও প্রকৃতিও তার স্বকীয়তা বজায় রাখার চেষ্টায় ব্যস্ত। ব্যাঘ্র প্রকল্পের মধ্যে মানুষই তার শুভবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে প্রকৃতিকে তার লুণ্ঠন থেকে বাঁচাতে চেয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মই বিচার করবে এ নিরন্তর সংগ্রামে কে জয়ী হবে।

সিমলিপাল আজ বন্যপ্রাণী পর্যটন মানচিত্রে অনন্য। কিন্তু সকল পর্যটক কি আজ সিমলিপালের অনাবিল প্রাকৃতিক সম্পদ দেখার সুযোগ পান ? বোধ হয় নয়। কারণ প্রয়োজনের তুলনায় পর্যটন ব্যবস্থা প্রতুল নয়। সিমলিপালে অবশ্য বিভিন্ন বন বিশ্রামাগার রয়েছে—রয়েছে নজর মিনারের সুন্দর বন্দোবস্ত। কিন্তু রাত্রিবাসের উপযোগী আরও পর্যটন আবাস প্রয়োজন—প্রয়োজন আরও সুন্দরভাবে সিমলিপালের অনাবিল প্রকৃতিকে উপভোগ করার সুযোগ।

ইন্দ্রাবতী

মানুষ ও প্রকৃতির নিরন্তর সংগ্রামের এক জীবন্ত উদাহরণ ইন্দ্রাবতী ব্যাঘ্র প্রকল্প। নদীর নামেই এ প্রকল্পের নাম। ৭৮-এ সালে অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষিত ও ১৯৮৩ সালে ব্যাঘ্র প্রকল্প পরিবারের সদস্য ইন্দ্রাবতী। বন মূলত মিশ্র পাতাঝরা ধরনের অর্থাৎ ড্রাই ডেসিডুয়াস। সেগুন ও বাঁশের সুবিন্যস্ত বনানী ইন্দ্রাবতীর বৈশিষ্ট্য। ইন্দ্রাবতী নদীর ধারে ধারে অবশ্য ঘন ঘাসের বন। মধ্য ভারতের একমাত্র প্রকৃষ্ট অভয়ারণ্য—যেখানে বুনো মোষ প্রজাতি বিপন্নতা মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সোয়াম্প ডিয়ারের পক্ষেও এ প্রকল্পাঞ্চলকে কান্‌হার বিকল্প বাসস্থান হিসেবে ধরা যেতে পারে। বিপন্ন বন্যপ্রাণী প্রজাতির

ব্যাঘ্র প্রকল্প	মোট আয়তন (বর্গ কিঃমিঃ)	পর্যটনের উপযুক্ত সময়	পর্যটকদের রাত্রিবাসের	ব্যাঘ্র প্রকল্প থেকে নিকটবর্তী শহর, রেল ও বিমান	পর্যটন রিজার্ভেশন আধিকারিক ও ঠিকানা	বন্যপ্রাণী বৈচিত্র্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
পালামৌ (বিহার)	৯৭৯	অক্টোবর থেকে মে	বেতলাতে পর্যটন নিবাস ও বন বিশ্রামাগার। এ ছাড়া বন বিশ্রামাগার রয়েছে কেড়, কেচি, মুনডু ও বারওয়াদি নামক স্থানে।	শহর : ডালটনগঞ্জ ও রেল : (২৫ কিঃ মিঃ) বিমান : রাঁচি (১৮০ কিঃ মিঃ)	ফিল্ড ডাইরেক্টর, প্রজেক্ট টাইগার, পালামৌ। পোস্ট : ডালটনগঞ্জ, জিলা : বিহার : ৪২২১০১	বাঘ, হাতি, গউর, চিতল, সম্বর, নিলগাই প্রভৃতি
বান্দিপুর (কর্ণাটক)	৬৯০	মার্চ থেকে জুলাই, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর	ফরেস্ট লজ ও কটেজ: বনবিশ্রামগৃহ— কাকানহাল্লা, মুলেহোল, কালকেব ও গোপালস্বামী (বেট্টা) প্রভৃতি।	শহর : গুণ্ডুলপেট (২০ কিঃ মিঃ) রেল : নানজুনগুড (৫৫ কিঃ মিঃ) বিমান : মহীশূর (৮০ কিঃ মিঃ)	ফিল্ড ডাইরেক্টর, প্রজেক্ট টাইগার, বান্দিপুর, মহীশূর : ৫৭০০০৪	বাঘ, হাতি, লেপার্ড, গউর প্রভৃতি
পেরিয়ার (কেরালা)	৭৭৭	সেপ্টেম্বর থেকে মে (বছরের সব সময়েই পর্যটন সম্ভব)	থেকাডিতে পর্যটন নিবাস, মানাকউলা, মুল্লাকুদি ও থানিকুদিতে বন বিশ্রামাগার ও অরণ্য নিবাস ও পর্যটন নিবাস।	শহর : কুমিলি (৪ কিঃ মিঃ) রেল : কোট্টায়াম (১১৪ কিঃ মিঃ) বিমান : মাদুরাই (১৪৫ কিঃ মিঃ) কোচিন (১৯০ কিঃ মিঃ)	ফিল্ড ডাইরেক্টর, পেরিয়ার, পোঃ কানজিকুজহি, জিঃ কোট্টায়াম, কেরালা	বাঘ, হাতি, গউর, বুনো শুয়োর, নিলগিরি টুর, মাউস ডিয়ার, মালাবার স্কুইরেল ভোঁদড় ইত্যাদি।
নাগার্জুন সাগর (অন্ধ্রপ্রদেশ)	৩৫৬০	অক্টোবর থেকে জুন	প্রকল্প অঞ্চলে তিনটি পর্যটন নিবাস	শহর : মাচেসলা ও রেল : (১৩ কিঃ মিঃ) বিমান : হায়দ্রাবাদ (১৫০ কিঃ মিঃ)	ফিল্ড ডাইরেক্টর, প্রজেক্ট টাইগার, শ্রীসাইলাম ড্যাম অন্ধ্রপ্রদেশ : ৫১২১০২	বাঘ, লেপার্ড, স্লথ বিয়ার, পাম সিবেট, হায়েনা, বার্কিং ডিয়ার, নিলগাই, চিংকারা, সম্বর, চিতল প্রভৃতি
নামধাপা (অরুণাচল প্রদেশ)	১৮০৮	অক্টোবর থেকে মার্চ	নামচিক, মিয়াও ও ডেবানে তিনটি বন বিশ্রামাগার	শহর : মার্গেরিটা (৬২ কিঃ মিঃ) রেল : লিডো (৫৬ কিঃ মিঃ) বিমান : ডিব্রুগড় (১৬৩ কিঃ মিঃ)	ফিল্ড ডাইরেক্টর, নামধাপা, পোঃ মিয়াও, জিলা : টিরাপ, অরুণাচল প্রদেশ	বাঘ, লেপার্ড, ক্লাউডেড লেপার্ড, স্নো লেপার্ড, গউর, গোরাল, টাকিন, কস্তুরীমৃগ, স্লো-লরিস রেড পাণ্ডা প্রভৃতি
মানস (আসাম)	২৮৪০	নভেম্বর থেকে মার্চ	মাথানগুড়িতে পর্যটন নিবাস ও বন বিশ্রামাগার	শহর : বরপেটা রোড ও রেল : (৪১ কিঃ মিঃ) বিমান : গৌহাটি (১৮৬ কিঃ মিঃ)	ফিল্ড ডাইরেক্টর, মানস, পোঃ বরপেটা রোড, জিলা : বরপেটা, আসাম : ৭৮১৩১৫	বাঘ, হাতি, গণ্ডার, বুনো মোষ, সোয়াম্প ডিয়ার, ক্লাউডেড লেপার্ড, পিগমি হগ, গোল্ডেন লাঙ্গুর প্রভৃতি

রণথম্বোর (রাজস্থান)	৩৯২	অক্টোবর থেকে এপ্রিল	যোগীমহলে পর্যটন নিবাস ও ঝুমার বাড়ী ফরেস্ট লজ প্রভৃতি	শহর : সোয়াইমাধোপুর ও রেল : (১৪ কিঃ মিঃ) বিমান : জয়পুর (১৩২ কিঃ মিঃ)	ফিল্ড ডাইরেক্টর, রণথম্বোর, পোঃ সোয়াইমাধোপুর, জিলা : রাজস্থান	বাঘ, লেপার্ড, হায়েনা, শিয়াল, সম্বর, চিতল, নিলগাই, চিংকারা, বুনো শুয়োর, স্লথ বিয়ার প্রভৃতি
করবেট (উত্তরপ্রদেশ)	৫২০	ফেব্রুয়ারী থেকে মে (জুন থেকে নভেম্বর পর্যটনের জন্য বন্ধ)	খিলাউলী, মারাপড়ুলী, বিজরানী, খৈরাল ও ধিকালাতে বন বিশ্রামগৃহ, লগহাট, পর্যটন হাট ও ক্যাম্পের ব্যবস্থা	শহর : রামনগর ও রেল : (১৯ কিঃ মিঃ) বিমান : ফুলবাগ (৫০ কিঃ মিঃ) (পন্থনগর) দিল্লী ও লখনউ থেকে নিয়মিত বাস সার্ভিস	ফিল্ড ডাইরেক্টর, করপেট, পোঃ রামনগর, জিলা : নৈনিতাল, উত্তরপ্রদেশ	বাঘ, হাতি, লেপার্ড, ঘরিয়াল, ভোঁদড় ইত্যাদি
বক্সা (পশ্চিমবঙ্গ)	৭৪৫	নভেম্বর থেকে এপ্রিল	প্রকল্প অঞ্চলে বেশ কয়েকটি বন বিশ্রামগৃহ	শহর : আলিপুরদুয়ার ও রেল : (২৫ কিঃ মিঃ) বিমান : কোচবিহার (৩৫ কিঃ মিঃ)	ফিল্ড ডাইরেক্টর, বক্সা, পোঃ রাজাভাতখাওয়া, জিলা : জলপাইগুড়ি	বাঘ, হাতি, গউর, লেপার্ড, লেপার্ড ক্যাট, সম্বর প্রভৃতি
ইন্দ্রাবতী (মধ্যপ্রদেশ)	২৭৯৯	জানুয়ারী থেকে এপ্রিল	বর্তমানে ব্যবস্থা নেই	শহর : জগদলপুর ও রেল : (১৬৮ কিঃ মিঃ) বিমান : রায়পুর (৪৮৬ কিঃ মিঃ)	ডাইরেক্টর, ইন্দ্রাবতী রিজার্ভ, পোঃ বিজাপুর, জিলা : বাস্তার, মধ্যপ্রদেশ : ৪৯৪৪৪	বাঘ, বুনো মোষ, সোয়াম্প ডিয়ার, চিতল, সম্বর, নিলগাই, চৌশিংগা, চিংকারা, গউর, স্লথ বিয়ার, লেপার্ড প্রভৃতি
কান্‌হা (মধ্যপ্রদেশ)	১৯৪৫	ফেব্রুয়ারী থেকে জুন (জুলাই থেকে নভেম্বর বন্ধ)	কিমলি, মুক্কি, সপিকর ও গড়িতে বন বিশ্রামগৃহ, পর্যটন লগহাট, মুক্কিতে পর্যটন নিবাস, কিপলিং ক্যাম্প	শহর : মান্‌ডলা রেল ও : (৬৫ কিঃ মিঃ) বিমান : জব্বলপুর (১৬০ কিঃ মিঃ) নাগপুর (২৪৭ কিঃ মিঃ)	ফিল্ড ডাইরেক্টর, কান্‌হা, পোঃ জিলা : মান্‌ডা, মধ্যপ্রদেশ	বাঘ, লেপার্ড, চৌসিংগা বারাসিংহা, গউর, নিলগাই, চিতল প্রভৃতি
মেলঘাট (মহারাষ্ট্র)	১৫৭১	জানুয়ারী থেকে জুন	কোলকাজে বন বিশ্রামাগার	শহর : আকোটা (৫০ কিঃ মিঃ) রেল : বাদনেরা (১২৪ কিঃ মিঃ) বিমান : নাগপুর (২৬০ কিঃ মিঃ)	ফিল্ড ডাইরেক্টর, ইস্ট মেলঘাট ডিভিশন, অমরাবতী মহারাষ্ট্র	বাঘ, লেপার্ড, বুনো কুকুর, সম্বর, বার্কিং ডিয়ার, চিংকারা, চিতল, নিলগাই, গউর প্রভৃতি

সিমলিপাল (উড়িষ্যা)	২৭৫০	ফেব্রুয়ারী থেকে জুন	চাহ্‌লা, নয়না, জশীপুর, আপার বরাকামরা, জেনাবিল প্রভৃতি স্থানে বন বিশ্রামাগার	শহর : বারিপাদা (৫০ কিঃ মিঃ) রেল ও বিমান : জামসেদপুর (১৪০ কিঃ মিঃ) ভুবনেশ্বর (৩৫০ কিঃ মিঃ) কলিকাতা (২৪০ কিঃ মিঃ)	ফিল্ড ডাইরেক্টর, সিমলিপাল পোঃ জশীপুর ময়ূরভঞ্জ উড়িষ্যা	বাঘ, হাতি, গউর, লেপার্ড, চিতল, মাউস ডিয়ার, সম্বর, প্যাঙ্গোলীন প্রভৃতি
সুন্দরবন (পশ্চিমবঙ্গ)	২৫৮৫	ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী	সজনেখালী পর্যটন নিবাস ও মোটর লঞ্চ, নৌকা	শহর : ক্যানিং ও রেল : (৫০ কিঃ মিঃ) বিমান : কলিকাতা (১৬৬ কিঃ মিঃ)	ফিল্ড ডাইরেক্টর, সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ, পোঃ ক্যানিং টাউন ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) পশ্চিমবঙ্গ	বাঘ, কুমীর, বুনোশুয়োর, চিতল, বিভিন্ন প্রকার সামুদ্রিক কচ্ছপ, পাখী প্রজাতি প্রভৃতি
দুধওয়া (উত্তরপ্রদেশ)	৪৯০	ডিসেম্বর থেকে জুন	দুধওয়া ও সাথিয়ানাতে বন বিশ্রামগৃহ, পর্যটন নিবাস ও টাইগার হ্যাভেন	শহর : দুধওয়া ও রেল : (১০ কিঃ মিঃ) বিমান : লখ্‌নউ (২৬০ কিঃ মিঃ)	ফিল্ড ডাইরেক্টর দুধওয়া টাইগার রিজার্ভ পোঃ লখিমপুর জিলা : খেরী উত্তরপ্রদেশ	বাঘ, লেপার্ড, সোয়াম্প ডিয়ার, স্লথ বিয়ার, হগ ডিয়ার, চিতল হরিণ প্রভৃতি
সরিস্কা (রাজস্থান)	৮০০	নভেম্বর থেকে জুন	টাইগার ডেন পর্যটন নিবাস ও বন বিশ্রামগৃহ। কিছু কিছু শীততাপ নিয়ন্ত্রিত।	শহর : আলওয়ার ও রেল : (৩৬ কিঃ মিঃ) বিমান : (১১০ কিঃ মিঃ)	ফিল্ড ডাইরেক্টর, সরিস্কা পোঃ ও জিলা : আলওয়ার রাজস্থান	বাঘ, লেপার্ড, বুনো কুকুর, নিলগাই, চৌশিংগা, চিংকারা, চিতল হরিণ প্রভৃতি

মধ্যে রয়েছে বাঘ ছাড়া লেপার্ড, হায়েনা, সম্বর, নেকড়ে, নীলগাই, চৌশিঙ্গা, চিংকারা, কৃষ্ণসার, বাইসন; স্লথ বিয়ার, বুনো শুয়োর প্রভৃতি। এখানে গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা ৪৮° সেন্টিগ্রেড অবধি উঠে যায়।

মধ্যপ্রদেশ সরকার ইন্দ্রাবতী নদীর উপরে নটি ড্যাম নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এরূপ পরিকল্পনার কিরূপ প্রভাব মানুষ ও প্রকৃতির উপর পড়বে সেটাই দেখার। ব্যাঘ্র প্রকল্প কি মানুষের ধ্বংসকারী প্রবৃত্তিকে রুখতে পারবে? বস্তারের বনভূমি এক সময় ৪০,০০০ বর্গকিলোমিটার ব্যাপ্ত ছিল—কিন্তু আজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা তাকে কোণঠাসা করেছে, প্রকৃতিকে করেছে রিক্ত। ইন্দ্রাবতীর বর্তমান ২৭৯৯ বর্গকিলোমিটার বনাঞ্চলই এখন শেষ ভরঁসা ও ব্যাঘ্র প্রকল্প তার বাঁচার সংগ্রামে লিপ্ত আপাতত।

পর্যটন ব্যবস্থা এখনও বিশেষ গড়ে ওঠেনি এখানে। তবে অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ ইন্দ্রাবতী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পর্যটকদের কাছে বিরাট প্রতিশ্রুতিস্বরূপ যদি সে অবশ্য তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে।

নাগার্জুনসাগর

ব্যাঘ্র প্রকল্প হিসেবে ঘোষিত হয় ১৯৮৩ সালে। নাগার্জুনসাগর ব্যাঘ্র প্রকল্পের নবীন সদস্য হলেও আয়তনের বিচারে অন্য সকল ব্যাঘ্র প্রকল্পকে পেছনে ফেলে একেবারে প্রথম। এ প্রকল্পের আয়তন ৩৫৬০ বর্গকিলোমিটার। নাগার্জুনসাগর ব্যাঘ্র প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে দুটি অত্যন্ত বিখ্যাত ড্যাম—নাগার্জুনসাগর ও শ্রীসাইলাম। আর রয়েছে শ্রীসাইলাম মন্দির—যেটি দেখার জন্য লক্ষ লক্ষ পর্যটক প্রতি বছর ভিড় করেন। এ প্রকল্পের বনাঞ্চল কেবল বিপন্ন বন্যপ্রাণীর বাসস্থান সুরক্ষার জন্যই প্রয়োজনীয় নয়—বনাঞ্চলের সুরক্ষার উপরে নির্ভর করছে অতি প্রয়োজনীয় ড্যাম দুটির ভবিষ্যৎ।

অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের হায়দ্রাবাদ থেকে ১৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এ প্রকল্পের হেড কোয়ার্টার। প্রকল্পাঞ্চলের বনের বৈচিত্র্যও বিশিষ্টতার দাবি করতে পারে—ট্রপিকালওয়েট এভারগ্রীন ও ড্রাই ডেসিডুয়াস—এ দু ধরনের বনই রয়েছে এখানে। বিপন্ন বন্যপ্রাণী প্রজাতিদের মধ্যে বাঘ ছাড়াও রয়েছে লেপার্ড, হায়েনা, স্লথ বিয়ার, নীলগাই, বার্কিং ডিয়ার, চৌশিঙ্গা, চিতল, সম্বর প্রভৃতি। পাখি প্রজাতি, পতঙ্গ ও রেপটাইল প্রজাতিতেও সমৃদ্ধ এ বনাঞ্চল।

অন্যান্য ব্যাঘ্র প্রকল্পের মত নাগার্জুনসাগরেরও বিশেষ বিশেষ সমস্যা রয়েছে ও সমস্যাগুলি সবই মানুষ ও প্রকৃতির সংঘাত নিয়ে। মাত্রাতিরিক্ত মোটর গাড়ির

যাতায়াত, গবাদিগোষ্ঠীর বিচরণ ও মানুষের ক্রমবর্ধমান কাঠ ও কাঠজাত দ্রব্যের চাহিদা। ভবিষ্যৎই একমাত্র বলতে পারে মানুষ ও প্রকৃতির এ নিরন্তর সংগ্রামের ফলাফল কি হবে। চেঞ্চু বলে এক আদিবাসী সম্প্রদায় প্রকল্পের বনাঞ্চলে বাস করেন। বনই তাঁদের জীবন ও জীবিকা। কাজেই এদের সমস্যা ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এ দুয়ের মধ্যে সমন্বয় বিধানই হবে মানুষ ও প্রকৃতির মেলবন্ধনের সোপান। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ব্যাঘ্র প্রকল্প স্থাপিত হওয়ার পরে এ বনাঞ্চলের সমৃদ্ধি বেড়েছে—বেড়েছে বাঘের সংখ্যাও। ৪০টি বাঘ (১৯৭৯) থেকে বেড়ে ৬৫টিতে (১৯৮৬) দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এর সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার দায়িত্ব আজ সকলের।

বক্‌সা

পশ্চিমবঙ্গের বক্‌সা ব্যাঘ্র প্রকল্প পরিবারের আর এক নবীন সদস্য। ১৯৮৩ সালে ৭৪৫ বর্গকিলোমিটার বনাঞ্চল ঘিরে এ প্রকল্প ঘোষিত হয়। সেমি এভারগ্রীন ও ময়েস্ট ডেসিডুয়াস বন বক্‌সার বৈশিষ্ট্য। সঙ্কোশ, মানস নদী দুটির ক্যাচমেন্ট-এ বক্‌সার বনাঞ্চল। এ ছাড়াও রায়ডাক, জয়ন্তী, বালা, দুয়া ও পাভা নদীগুলিও বক্‌সা বনাঞ্চলকে সমৃদ্ধ করেছে নানাভাবে। বক্‌সার বনাঞ্চলের সঙ্গে অসমের মানস অরণ্য ও ভুটানকে ভাল ভাবে সংযুক্তিকরণের কাজ শেষ হলে বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ অনেকাংশে সফল হবে বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ বন্যপ্রাণীরা তখন তাদের ইপ্সিত করিডর পাবে।

বাঘ ছাড়াও এ বনাঞ্চলের অন্যান্য বিপন্ন বন্যপ্রাণী প্রজাতি হচ্ছে লেপার্ড হাতি, বাইসন, বার্কিং ডিয়ার, চিতল হরিণ, সিভেট ও লেপার্ড ক্যাট প্রভৃতি। এ ছাড়া রয়েছে বিভিন্ন পাখি প্রজাতি ও রেপটাইল প্রজাতির উপস্থিতি। লতা, শেওলা আগাছা ও ছোট-বড় বৃক্ষপ্রজাতি বক্‌সাকে দিয়েছে এক অতি ঘন বনের সবুজ আচ্ছাদন। পশ্চিমবাংলা আদিম ডুয়ার্স অরণ্যের প্রতিনিধি এ বক্সার কিন্তু বিশেষ কিছু সমস্যাও আছে। সমস্যার গভীরে রয়েছে মানুষ ও প্রকৃতির সংঘাত। ডোলোমাইট খনির কাজ বক্‌সা অরণ্যকে আজ ক্ষত-বিক্ষত করছে। এর সঙ্গে যোগসাজসে রয়েছে কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর দুরভিসন্ধি। রাজনীতি ও আইনের নাগপাশ থেকে মুক্তি পেলে বক্‌সা পর্যটন মানচিত্রে যে এক স্বকীয় ভূমিকা নেবে এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত। মানুষের শুভবুদ্ধির প্রার্থনায় ব্যাপৃত বক্‌সা কি তার প্রাকৃতিক অনাবিল সৌন্দর্য মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারবে—ভবিষ্যতের গর্ভেই এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে।

ব্যাঘ্র প্রকল্পে পর্যটন

আজ. ভারতবর্ষে ২৪৭টি অভয়ারণ্য ও ৫৩টি ন্যাশনাল পার্ক স্থাপিত হয়েছে (১৯৮৫ সালের ১ জানুয়ারি পর্যন্ত) ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বনের আয়তন এক লক্ষ বর্গকিলোমিটারের উপরে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বনাঞ্চলের বর্তমান আয়তন সমগ্র বনের আয়তনের ১২ শতাংশ ও সমগ্র জমির আয়তনের শতকরা ৩ শতাংশ।

ব্যাঘ্র প্রকল্পের বনাঞ্চল আজ ভারতবর্ষের বন্য প্রাণী—পর্যটনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে ও সমগ্র পর্যটন মানচিত্রেও এ ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাধারণ পর্যটক আজ ব্যাঘ্র প্রকল্পের বনাঞ্চলে গিয়ে রোমাঞ্চের ভাগ নিতে বিশেষ আগ্রহী। কিন্তু কিরূপ ব্যবস্থা রয়েছে বিভিন্ন ব্যাঘ্র প্রকল্পে পর্যটনের ক্ষেত্রে সেটা সাধারণ মানুষ জানতে বিশেষ আগ্রহী। এরই প্রসঙ্গে তার তালিকা দেওয়া হয়েছে।

সুন্দরবন

সমুদ্র উপকূলবর্তী বন বা সমুদ্রবর্ন, সুন্দরী নামক বৃক্ষের বন বা সুন্দর অর্থাৎ মনোরম বন—যে রূপেই 'সুন্দরবন' নামের উৎপত্তি হোক না কেন—সুন্দরবন যে মনোরম বন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানীদের মতে সুন্দরবনের উৎপত্তি তুলনামূলকভাবে আধুনিক কালে। এমনকি দু থেকে তিন হাজার বছর আগে পর্যন্ত এই অঞ্চল সমুদ্রের অতলে নিমজ্জিত ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে গঙ্গার মূল প্রবাহ ভাগীরথী থেকে ভৈরব ও তারপর পদ্মায় পরিবর্তিত হওয়ার ফলে সুন্দরবনে বদ্বীপের উৎপত্তি হয়। ভয়াল সুন্দর বাঘ, পৃথিবীর বৃহত্তম কুমীর, বিষধর সাপ, হাঙ্গর, কামট, বিভিন্ন পাখি প্রজাতি, শামুক, কাঁকড়া, মাছ, বন্য বরাহ, অনিন্দ্য সুন্দর হরিণ শাবক এই সুন্দরবনকে বিশ্ব-বন্য প্রাণী-মানচিত্রে অদ্বিতীয় করেছে।

সাধারণ মানুষ সুন্দরবনের বাঘকে 'রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার' নামে চিহ্নিত করে থাকেন। কিন্তু বিজ্ঞানের পরিভাষায় এরূপ নামের কোনও যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা নেই। আমাদের ক্ষমাহীন অবহেলার ফলেই এক সময়ে আমাদের চরম মূল্য দিতে হয়েছিলো, যখন জাভা-দেশের গণ্ডার ও বুনো মোষ সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে লুপ্ত হয়। সেই দুঃখজনক ঘটনার কথা মনে রেখেই সুন্দরবনের বাঘকে অবহেলার যূপকাষ্ঠে বলি হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য এই বলিষ্ঠ

পদক্ষেপ—অর্থাৎ 'ব্যাঘ্র প্রকল্প' রচনা করা হয়েছে। ১৯৭৩ সালেই এ অঞ্চলে ব্যাঘ্র প্রকল্প স্থাপিত হয় ভারতবর্ষের অন্য আট'টির সঙ্গে।

প্রকৃতির সত্যিই এক অভিনব সৃষ্টি সুন্দরবনের এ বাঘ। এদের বুদ্ধি, চাতুর্য, মানুষের সম্পর্কে জ্ঞান এক আকর্ষণীয় পশুকাহিনীর জীবন্ত নায়কের মর্যাদায় এদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মানুষ-খেকো বাঘ সম্পর্কে আমাদের কুসংস্কার এদের উপর বহু অতি-প্রাকৃত গুণাবলী আরোপ করতে সহায়তা করেছে। তাই সুন্দরবনের জঙ্গলে প্রবেশের আগে বাউলী (কাঠুরে), মৌলে (মধু সংগ্রহকারী) বা জেলেরা দক্ষিণরায়, নারায়ণী মা, বনবিবি, কালু খাঁ, শা জঙ্গলী, গাজী সাহেব প্রভৃতির পূজা অর্চনা করেন এই বিশ্বাসে যে, ঐ সব দেবতাদের পূজাই কেবল সুন্দরবনের বাঘের মতো ভয়ঙ্কর শত্রুর ধ্বংসলীলার বিরুদ্ধে তাদের রক্ষা করতে সক্ষম হবে। এ সব সত্ত্বেও যখন কোন হতভাগ্য বাঘের কবলে পড়েন তখন সে সেই কেবল প্রতাপান্বিত শত্রুর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করেন না। এর জন্যে তাঁদের ভাগ্যকেই দায়ী করে থাকেন ও পূজা-অর্চনা প্রভৃতিকে আশ্রয় করে মনের শক্তিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। তাই সুন্দরবনের বাঘ এ-অঞ্চলের মানুষের কাছে শিব ও অশিব দুয়েরই জীবন্ত প্রতিমূর্তি। যার বিরুদ্ধে কোন নালিশ চলে না।

মোটরলঞ্চ নিয়ে সুন্দরবনের মায়াদ্বীপ নদীর মাঝখান দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি তখন সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের অধিকর্তা। জল শান্ত কাঁচের মত স্বচ্ছ। সময়টা এপ্রিল মাসের শেষাশেষি ও সকাল। সুন্দরবনের মধুমাস। মধু সংগ্রহকারীর দল এ সময় রুজি-রোজগারের তাগিদে মহাজনের নৌকো নিয়ে মাস দেড়েকের চাল, ডাল, জল নিয়ে জঙ্গলে মধু সংগ্রহে বেরিয়ে পড়ে। প্রকৃতি সে সময় সুন্দরবনকে বিচিত্র রঙে সাজিয়ে দেয়—প্রায় সব গাছগুলোতেই সে সময় ফুল ফোটে। ফুলের সুগন্ধ ও ব্যাপকতা আকৃষ্ট করে ফুল-পিপাসু মৌমাছিদের, যারা সুন্দরবন অঞ্চলে দু থেকে আড়াই মাসের সংসার গড়তে চলে আসে সুদূর হিমালয় থেকে। মোটরলঞ্চের আরোহীরা খলসি ফুলের সুগন্ধ পাচ্ছিল ও চারিদিকের অসংখ্য মৌমাছিদের ইতস্তত যাওয়া-আসা লক্ষ্য করছিল। কিন্তু দূরে কৃষ্ণকায় বস্তুটি কি ? কাঠের গুঁড়ি ?—লঞ্চের সারেঙ-এর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বস্তুটিকে দেখতে ব্যস্ত। আরও কিছুটা কাছে যেতেই বোঝা গেল—আপাতদৃষ্ট কালো মতন বস্তুটি সুন্দরবন বাঘেরই মাথা। বাঘটি প্রায় মাঝ নদীর এপার থেকে ওপারে যাচ্ছিল। লঞ্চ আসায় খানিকটা গতিপথ পরিবর্তন করল। বহু শিকার কাহিনী পড়েছি—সেখানে সুন্দরবনের বাঘকে জলে শিকার করার সমস্যার কথা বলা

হয়েছে। একটি চলমান যান থেকে আরেকটি চলমান বস্তুকে শিকার করার সমস্যা তো আছেই, আর তা ছাড়া বাঘ যখন জলে সাঁতার কাটে তখন কেবলমাত্র নাকের উপরিভাগ টুকুই দেখা যায় মাত্র।

হঠাৎ এক শক্তিশালী বাতাস এসে গেল। মোটরলঞ্চ জলের ঢেউয়ের উপর চড়ে যেতে লাগল। লঞ্চের আরোহীদের মধ্যে তখন প্রবল উত্তেজনা। সকলেই কিছু না কিছু জিনিস হাতে তুলে নিল ও বাঘের মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়তে লাগল—কেউ লাঠি কেউ বা কয়লার টুকরো প্রভৃতি। বেচারা বাঘকে কখনও লঞ্চের এপাশে কখনও ওপাশে দেখা যেতে লাগলো। লঞ্চের স্টিয়ারিং এপাশে ওপাশে ঘুরিয়ে বাঘটিকে স্বাভাবিকসভাবে যৎপরোনাস্তি বাধা দেওয়া হতে থাকল। বাঘটিকে কেউ কেউ কাঠের এবং বাঁশের লাঠি দিয়ে মারতে সচেষ্ট হল। লাঠিটিকে বাঘটি মুখে করে দাঁত দিয়ে ভাঙ্গতে লাগল অনায়াসে। অন্যান্য নিক্ষিপ্ত দ্রব্যাদিরও একই অবস্থা। বাঘটির এ সকল কার্যকলাপ দেখতে দেখতে সকল আরোহীই যুগপৎ উত্তেজিত ও বিব্রত। লঞ্চের রাঁধুনী গরম জলও ছিটিয়ে দিল বাঘের মাথা লক্ষ্য করে কিন্তু গরম জল মায়াদ্বীপের শীতল জলের সঙ্গেই মিশে গেল বাঘের মাথা স্পর্শ না করে।

মানুষ, লঞ্চ ও বাঘের এ ঘটনা চলল প্রায় ঘণ্টা খানেক ধরে। হঠাৎ কি হল—বাঘটি সাময়িক আশ্রয়ের খোঁজে লঞ্চের সঙ্গে বেঁধে রাখা ডিঙ্গিতে উঠে পড়ল। ডিঙ্গিতে উঠে বাঘটি একেবারে ডিঙ্গির কাঠের পাটাতনের নীচে চলে গেল—যেন ওর গভীর ঘুমের প্রয়োজন। লঞ্চের আরোহীদের উত্তেজনা তখন চরমে। কারণ অনেকের ধারণা বাঘটি এবার লাফিয়ে লঞ্চে আসবে। লঞ্চের সারেং তখন ডিঙ্গিতে একটি বড় দড়িসহ নোঙর ফেলে দিয়ে লঞ্চ ও ডিঙ্গির মধ্যে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে চেষ্টা করল। পরে লঞ্চটি চলতে লাগল। নিকটবর্তী কাঠ কাটার নির্দিষ্ট বনাঞ্চলের দিকে। সেখানে অনেক লোকজন ও নৌকোর সাহায্য গ্রহণের জন্য। কার ভাগ্য সুপ্রসন্ন এটা অনুক্ত রেখেই আরও একটা ঘটনা ঘটে গেল। যেতে যেতে উঠল প্রবল ঝড় ও যে নদীটা অতিক্রম করতে হবে তার নামও বিদ্যানদী—যা কি না স্থানে স্থানে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার চওড়া। স্বভাবতই ডিঙ্গির আরোহীর সুখনিদ্রায় কিছুটা ব্যাঘাত হলো কারণ ডিঙ্গিটি বিপজ্জনকভাবে জলের ঢেউয়ে দুলতে শুরু করল। পরে ডিঙ্গিটিও দড়ি ছিঁড়ে জলে ডুবে গেল সঙ্গে আরোহীকে নিয়ে। কিন্তু এ তো যে সে আরোহী নয়। সকলের বিহ্বল চোখের সামনে দ্রুততম সাঁতারুর মত বিদ্যা নদী অনায়াসে সাঁতার কেটে জঙ্গলের মধ্যে চলে গেল বাঘটি। তিন ঘণ্টা মানুষ, লঞ্চ ও

প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে বিচিত্র ক্ষমতাধর সুন্দরবনের বাঘ তার বাসস্থানে চলে গেল—যেন কোন কিছুই ঘটেনি বিগত তিন ঘণ্টায়।

মানুষ ও মানুষ-খেকোর সম্পর্ক খুঁজতে সুন্দরবনের জলকাদার জঙ্গলে দীর্ঘ দশ বছর কাজের সুবাদেই কাটিয়েছি। বোঝার চেষ্টা করেছি এ সম্পর্কের ধরন-ধারণ ও গভীরতা। স্বামীহারা বিধবা, পুত্রহারা মা ও বাবাকে দেখে সুন্দরবনের বাঘকে পৃথিবীর হিংস্রতম জীব হিসেবে চিহ্নিতও করেছি। কিন্তু সুন্দরবনের মাতলা-বিদ্যা নদীর জলে সমস্ত শোক বিসর্জন দিয়ে যখন দেখছি এ সব হতভাগ্য মৃতের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, আবার সুন্দরবন জঙ্গলে যেতে উদ্যত তখন মনে হয়েছে এটাই জীবন-প্রবাহের চরম সত্য। মৃত্যু জীবনেরই মত একটা ঘটনা মাত্র। জীবন-দর্শনের গভীর সত্য বোধ হয় সুন্দরবনের মানুষ উপলব্ধি করেছে নিজেদের জীবন দিয়ে। কারণ প্রতি বছর পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশজন হতভাগ্যের বাঘের পেটে যাওয়া ঘটনাগুলোকে সুন্দরবনের মানুষের জীবন-দর্শনে এমন কোনও রেখাপাত করেনি যে তারা সে কাজ থেকে বিরত হবে।

সুন্দরবনের বাঘকে যেমন সুন্দরবনের মানুষ থেকে পৃথক করা যায় না, তেমনিই সুন্দরবনের মানুষকেও সুন্দরবনের বাঘ থেকে পৃথক করে ভাবার কোন উপায় নেই। কালান্তক মৃত্যু সদৃশ বাঘ ও জীবনবাদী মানুষের মধ্যে সহাবস্থানের এমন প্রত্যক্ষ নিদর্শন সভ্য পৃথিবীতে প্রায় দুর্লভ বলেই মনে হয়।

জন্ম : ২৬ জানুয়ারি, ১৯৪৩। বাংলাদেশের বরিশালে। আদ্যন্ত মেধাবী ছাত্র। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যান বিজ্ঞানে এম. এস-সি। দেরাদুনের ইন্ডিয়ান ফরেস্ট কলেজ থেকে ফরেস্ট্রি বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা। মানুষ, উদ্ভিদ ও প্রাণীর সম্পর্ক নিয়ে পরিসংখ্যান-ভিত্তিক গবেষণা করে পি. এইচ. ডি। ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারের উর্ধ্বতন সরকারী অফিসার। দীর্ঘ দশ বছর কেটেছে সুন্দরবনে, ব্যাঘ্র প্রকল্পের অধিকর্তা ছিলেন। এখন ভারত সরকারের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিভাগের পূর্বাঞ্চলের আঞ্চলিক অধিকর্তা।
বন ও বন্যপ্রাণী নিয়ে গবেষণা চাকরিজীবনের শুরু থেকেই। বন ও বন্যপ্রাণী নিয়ে দেশে ও বিদেশে প্রকাশিত শতাধিক রচনা।
কর্মসূত্রে ঘুরে এসেছেন আফ্রিকা ও ইংল্যান্ড।

প্রচ্ছদ □ অমিয় ভট্টাচার্য